RD
780
SHN

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল সঙ্গীতে সমাজসচেতনতা

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক আহমদ কবির
(অবসরপ্রাপ্ত)
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষকের নাম

সৈয়দা সারাহ্ শিমুল
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিঃ ৬৬
শিক্ষাবর্ষঃ ২০০৯-২০১০

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, 'নজরুল সঙ্গীতে সমাজসচেতনতা' শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য লিখিত। এটি অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি বা অন্য কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

465984

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

২৭/০৫/২০১২

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক

আহমদ কবির

(অবসরপ্রাপ্ত)

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৭.৫.১২

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

ছোটবেলা থেকেই নজরুল সঙ্গীতের প্রতি আমার প্রবল আগ্রহ ছিল। যে কারণে যখন গবেষণা করার সুযোগ ঘটে, গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে নজরুল সঙ্গীতকেই বেছে নেই। বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামের মতামত নেই। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে ১৯৯৮ সালে এম.ফিল. কোর্সে ভর্তি হই। পরবর্তীতে এম.ফিল কোর্স পিএইচ.ডি.তে স্থানান্তরিত হয়। উক্ত কোর্স সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রথমে আমাকে দুই বৎসরের প্রেষণ এবং পরে এক বৎসরের শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করে। নির্ধারিত সময়ে গবেষণার কাজ শেষ করতে না পারায় আমি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করার পর আমাকে ঢাকার বাইরে বদলী করা হয়। ২০০৩ সালে আমার একমাত্র কন্যার জন্মের পর গবেষণা কাজে ব্যাঘাত ঘটে। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাকে কর্মরত অবস্থায় গবেষণা চালিয়ে যাবার অনুমতি দেয়।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ এর অনুপ্রেরণা ও দিক নির্দেশনা এ অভিসন্দর্ভ রচনায় সতত সক্রিয় ছিল। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমার জন্যে তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখতে চাই। বিভিন্ন সময়ে সর্বশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আহমদ কবির এর সঙ্গে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। তাঁকেও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কৃতজ্ঞতা জানাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দকে, যাঁরা আমাকে গবেষণা করার সরকারি অনুমতি পেতে সহায়তা করেছেন। আর বিশেষভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাই দীর্ঘ সময় পরও থিসিস জমাদানের সুযোগ দেওয়ার জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে থিসিস জমাদানের ব্যাপারে সর্বোতভাবে সহায়তা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, নজরুল ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার, সরকারী গণ গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে সহায়তা করেছেন। তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আর একজনের কথা না বললেই নয়। তিনি হচ্ছেন আমার সুহৃদ, সতীর্থ; কুমিল্লা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, নজরুল গবেষক ও কবি ড. আবু হেনা আবদুল আউয়াল। তিনি আমাকে একাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর সুচিন্তিত মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করতে চাই না।

আমার গবেষণা কাজের জন্য আমি আমার আব্বা-আম্মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনকে অনেক ক্ষেত্রে সময় দিতে পারিনি। এছাড়া আমার একমাত্র কন্যা প্রিয়ন্তী সারাহর অনেক আবদার রাখতে পারিনি। গবেষণায় আমার স্বামী মোঃ গোলাম কারুকের অনুপ্রেরণা ও সার্বিক সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের সবার সাথেই আমার সম্পর্ক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উর্ধ্বে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	৩-৪
প্রথম অধ্যায়ঃ বাংলা সমাজসচেতন সঙ্গীতের ঐতিহ্য ও নজরুলের আবির্ভাব	৫-১৬
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ নজরুলের দেশ-কাল-পটভূমি	১৭-২৭
তৃতীয় অধ্যায়ঃ নজরুল সঙ্গীতের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ	২৮-৫৫
১. প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত	৩১-৩২
২. প্রকৃতি বিষয়ক সঙ্গীত	৩৩
৩. ধর্মীয় সঙ্গীত	৩৪-৪৩
৪. দেশাত্মবোধক সঙ্গীত.....	৪৪-৫০
৫. বিবিধ	৫১-৫৫
চতুর্থ অধ্যায়ঃ নজরুলের সমাজসচেতন সঙ্গীত	৫৬-১০৬
প্রথম পরিচ্ছেদঃ শ্রমজীবীদের গান	৫৮-৬৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ নারী জাগরণমূলক গান	৬৪-৭২
তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ হিন্দু-মুসলিম জাগরণমূলক গান	৭৩-৮৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ দেশপ্রেমমূলক গান	৮৪-৮৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ স্বাধীনতা ও রাজনীতিভিত্তিক গান	৮৯-১০৬
উপসংহার	১০৭
গ্রন্থপঞ্জি	১০৮-১১০
পরিশিষ্ট	১১১-১১৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ছিলেন সম্পূর্ণভাবে সমাজসচেতন। কবিতা, গান, প্রবন্ধে তিনি সমাজ পরিবর্তনে এগিয়ে আসার বিপ্লবী আহবান করেছেন। বিশেষভাবে সঙ্গীতে তাঁর এই সমাজসচেতনা পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুট। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তিনি একাধারে গীতিকার, সুরকার, শিল্পী। বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ তিনি প্রায় পাঁচ হাজার গান রচনা করেছেন। তাঁকে পূর্ণভাবে জানতে হলে তাঁর গানের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিকাশ এসব সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে নি:সৃত হয়েছে।

আমাদের দেশে নজরুল সঙ্গীতের উপর এযাবৎ যে সকল গবেষণা হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। তাঁর সমাজসচেতন সঙ্গীত নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা এদেশে এখনও হয়নি। তাঁর গানে যুগ-পরিবেশের চিত্র উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ বিষয়টি গবেষণার দাবী রাখে।

নজরুল সঙ্গীতে সমাজসচেতনা অন্বেষণে এ অভিসন্দর্ভকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ বাংলা সমাজসচেতন সঙ্গীতের ঐতিহ্য ও নজরুলের আবির্ভাব। এ অধ্যায়ে নজরুলের পূর্ববর্তী সময়ে বাংলা সমাজসচেতন সঙ্গীতের পটভূমি আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ নজরুলের দেশ-কাল-পটভূমি। এ অধ্যায়ে নজরুলের সমসাময়িক ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ নজরুল সঙ্গীতের শ্রেণীকরণ। নজরুল সঙ্গীতের বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থে যেভাবে নজরুল সঙ্গীতের শ্রেণীকরণ করা হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলা গানের অপর চারজন প্রধান গীতিকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৯৬৩-১৯২৩), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) এর শ্রেণীকরণ আলোচনায়

Dhaka University Institutional Repository

এসেছে। নজরুলের গানের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ করে প্রেম, প্রকৃতি, দেশাত্মবোধক ও বিবিধ গানের আলাদাভাবে আলোচনা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ নজরুল সঙ্গীতে সমাজসচেতনতা। নজরুলের সকল গানকে প্রতিনিধিত্ব করে এমন উদ্দীপনামূলক গানগুলো বাছাই করে এ অধ্যায়ে পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ শ্রমজীবীদের গান। নজরুলই প্রথম বাংলা গানে শ্রমজীবীদের অধিকার আদায়ের কথা বলেছেন। মেহনতী মানুষকে নিয়ে লেখা গানগুলো এখানে আলোচনায় এসেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ নারী জাগরণমূলক গান। নজরুল শুধু নারীর মহিমাই বর্ণনা করেননি; নারীকে প্রয়োজনে দাবী আদায়ে সোচ্চার হতে আহবান করেছেন। এ পরিচ্ছেদে নারী জাগরণমূলক গানগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ হিন্দু-মুসলিম জাগরণধর্মী গান। মুসলিম সমাজের জন্য লেখা জাগরণধর্মী গান, হিন্দু সমাজের ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করার গান, হিন্দু-মুসলিম মিলন গান প্রভৃতি এ পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ দেশপ্রেমমূলক গান। দেশবাসীর দেশাত্মবোধ উজ্জীবনে সহায়ক হয়েছে; এমন গানগুলো এখানে আলোচনায় এসেছে ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ স্বাধীনতা ও রাজনীতি বিষয়ক গান। নজরুলের সংগ্রামী গানগুলো এখানে আলোচনায় এসেছে।

সংগ্রামী গানের মধ্যে রয়েছে: জাগরণমূলক গান, রাজনীতি বিষয়ক গান, ব্যক্তি বিষয়ক গান, ব্যঙ্গাত্মক গান প্রভৃতি।

উপসংহারঃ উপসংহারে সম্পূর্ণ অভিসন্দর্ভের সার-সংকলন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলা সমাজসচেতন সঙ্গীতের ঐতিহ্য ও নজরুলের আবির্ভাব

হাজার বছরের পুরনো বৌদ্ধ ধর্মীয় সঙ্গীত চর্যাগীতিকা বাংলা গানের আদি নিদর্শন। চর্যাপদ ধর্মীয় সঙ্গীত হওয়ায় এ গানগুলোর বক্তব্যে উপাসনা বা স্তোত্রবাক্যের প্রাধান্য ছিল। সঙ্গীতের আসল কোন পর্যায়েই এগুলো পড়ে না। তবে তা তৎকালীন সমাজ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচ্য। সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষের দুঃখ-কষ্ট, জীবন-সংগ্রামের চিত্র এতে রয়েছে। এই সমাজমনস্কতা বাংলা গান থেকে কখনো মুছে যায়নি।

সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগব্যাপী বাংলা গানে আধ্যাত্মিকতার মূলে রয়েছে মানবিক আবেদন। ধর্মীয় মতবাদের মর্মকথা হল প্রেম। মানুষই যার প্রধান উপলক্ষ্য। জয়দেব, শ্রীচৈতন্যদেব এবং পরবর্তী বৈষ্ণব সাধকবৃন্দ, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত তাঁদের সংগীতে এই প্রেমধর্মের কথাই বলেছেন। যেখানে মানবতাবাদের চিত্রই আমরা পাই। বাউলরা শুধু অধ্যাত্মবাদের তত্ত্ব নিয়ে গান লিখেননি। মৌলবাদের অত্যাচার-নির্যাতনে অতীষ্ট হয়েও তাঁরা গান লিখেছেন। লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০) যখন বলেন–

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন বলে জাতের কিরূপ দেখলাম না এ নজরে।[১]

তখন তাঁর গানে অধ্যাত্মচেতনার চেয়ে সমাজচেতনা প্রবল বলে মনে হয়।

বাংলা সমাজসচেতন সঙ্গীতের পটভূমি আলোচনা করতে গেলে এর সূচনাকাল ধরতে হবে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন কালকে। উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু করে অসহযোগ আন্দোলন অর্থাৎ ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে রচিত অজস্র দেশাত্মবোধক গান প্রমাণ করে জাতীয় আন্দোলনে সঙ্গীত অপরিসীম প্রভাব রেখেছিল। এ সময়ে রচিত দেশাত্মবোধক গানগুলি স্বদেশী গান হিসেবে পরিচিত। পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল স্বদেশী গান। শুধু পরাধীনতার বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করাই এসকল গান রচনার উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজে নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষদের অর্থনৈতিক মুক্তি শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত বাংলা স্বদেশী গানের বীজ সন্ধান করেছেন পূর্ব যুগের শক্তি উপাসক কবিদের মাতৃসাধনার মধ্যে। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'মাতৃবন্দনা' (১৯৬৩) গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "কংগ্রেস আন্দোলনের আরম্ভের সঙ্গে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের আরম্ভ নয়। ইহার প্রস্তুতি চলিতেছিল অনেকদিন পূর্ব হইতেই। বাঙলা দেশে দেখিতে পাই, এই ক্ষেত্র প্রস্তুতি চলিতেছিল সাহিত্য ও সংগীতের মাধ্যমে। .... বাঙলা দেশ মাতৃপূজার দেশ, দেশকে এখানে প্রথম হইতেই চৈতন্যময়ী প্রেমময়ী দেবী বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। পৌরাণিক মাতৃপূজা এবং নবদীক্ষায় লব্ধ দেশমাতৃকার পূজা এখানে অবাধে মিলিয়া মিশিয়া একেবারে এক হইয়া গিয়াছে।"[২]

মাতৃসাধনার সঙ্গে দেশভক্তির মিশ্রণ হিন্দুমেলার পূর্বে ঘটেনি বলে অরুণকুমার বসু মন্তব্য করেছেন। তিনি মনে করেন দেশাত্মবোধ বিকশিত হওয়ার প্রথম পর্যায়ে দেশভক্তি ও ব্রহ্মভক্তি মিশে গিয়েছিল। রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) লেখায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রামমোহন রায় বাঙলার প্রথম ব্রহ্মগীতকার। তার গানেই প্রথম স্বদেশ শব্দটি পাই।[৩]

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি
তোমার রচনামধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।[৪]

বাংলা স্বদেশী সংগীতের উদ্ভবের কারণ প্রসঙ্গে গীতা চট্টোপাধ্যায় 'বাংলা স্বদেশী গান' গ্রন্থে বলেছেন,

"বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ প্রসঙ্গের আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীতে। চর্যাপদ থেকে রামপ্রসাদের গান পর্যন্ত প্রায় সাতশ বছরের সাহিত্যে স্বদেশ সম্পর্কিত গান বা কবিতা নেই।... বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেম নির্ভর সাহিত্য রচনার উদ্ভবের কারণের মূলে প্রধান ও অপ্রধান কয়েকটি কারণ আছে। প্রধান কারণটি সাহিত্যিক কারণ নয় — রাজনৈতিক ও সামাজিক। ইংরেজের সঙ্গে পরিচয় এবং পরাধীনতার বোধ-এ দুটি বোধের সম্মিলনের ফলে আমাদের দেশপ্রেমের বোধ পরিপুষ্টি লাভ করে এবং সাহিত্যে নানাভাবে সেই বোধটি উন্মোচিত হতে থাকে।"[৫]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) স্বদেশ বিষয়ক কবিতাগুলি বাঙালীর দেশপ্রেমের চেতনাকে শাণিত করেছে। তাঁর স্বদেশ বিষয়ক কবিতাগুলি হচ্ছে : ভারতভূমির দুর্দশা, ভাষা, মাতৃভাষা, স্বদেশ, ভারত সন্তানের প্রতি, ভারতের অবস্থা, ভাগ্য বিপ্লব

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি। ঈশ্বরগুপ্তের পর কবি মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর স্বদেশ বিষয়ক কবিতার পর্যায়ে পড়ে বঙ্গভাষা, কপোতাক্ষ নদ, ভারত-ভূমি, কবি-মাতৃভাষা প্রভৃতি কবিতা। উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে দেশপ্রেমের বোধ বাঙালীকে পরাধীনতার বিপক্ষে উজ্জীবিত করেছে। কবিতার পাশাপাশি গানেও এর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

অরুণকুমার বসু বাংলা দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, "সংবাদ প্রভাকরে ঈশ্বরগুপ্তেরত স্বদেশপ্রেম প্রচার এবং মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি অতন্দ্র অনুরাগের ঘোষণা, রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান', রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ ও দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে দেশভক্তির উদ্দীপক রচনা প্রকাশ, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন, হিন্দুমেলা, জাতীয় নাট্যশালা স্থাপন, 'নীলদর্পণে'র অনুবাদ প্রকাশ ও অভিনয় প্রভৃতি বিচিত্র বিবিধ ঘটনায় আমাদের স্বদেশচতনার ইতিহাস উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল।[৬] এসকল ঘটনার মধ্যে হিন্দু মেলাকে (১৮৬৭) ঘিরে যে দেশাত্মবোধের উন্মেষ ঘটেছিল দেশাত্মবোধক সঙ্গীতে তার প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী। তবে এরও আগে রচিত রামনিধি গুপ্তের (১৭৪১-১৮৩৯) লেখা একটি গানকে বাংলা দেশাত্মবোধক গানের আদি রচনা বলে মনে করা হয়। গানটি হচ্ছেঃ

নানান দেশের নানান্ ভাষা
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা?
কত নদী সরোবর
কি বা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা?[৭]

হিন্দু মেলাকে কেন্দ্র করে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫), গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৬-১৯১৮), মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) প্রমুখ জাগরণী গান লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) লেখা বন্দেমাতরম্ গানের দেশপ্রেমের জোয়ারে দেশ প্লাবিত হয়।[৮] হিন্দু মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা "মিলে সবে ভারত সন্তান' গানটি গীত হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে আরও একটি বিখ্যাত গান গীত হয়। 'লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে', এর রচয়িতা

Dhaka University Institutional Repository

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[৯] ১৮৬৭ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গানটি জাতীয় সংগীত রচনার প্রথম সার্থক প্রয়াস হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।[১০] হিন্দু মেলাকে ঘিরে তাঁর গানটি ছিল এরকম–

মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান ॥

ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতি, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী;
শতখনি রত্নের নিধান ॥
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয় ॥[১১]

হিন্দুমেলাকে ঘিরে স্বদেশী গানের যাত্রা শুরু। পরবর্তীতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে এত বিপুল সংখ্যক গান রচিত হয়েছে যা কি না প্রমাণ করে ভারতের সকল জাতীয় আন্দোলনে এ ধরণের গান কী অপরিসীম প্রভাব ফেলেছিল। অরুণকুমার বসুর মতে অর্ধ-শতকের কিছু বেশী সময়ের মধ্যে অর্ধ-শতকের বেশী এই দেশপ্রীতিমূলক কাব্যগীতির সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি 'বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থে ১৮৭৯ থেকে শুরু করে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করেন জাতীয় সংকলন গ্রন্থের এমন একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন, যা নীচে তুলে দেওয়া হল।[১২]

ভারতগান	রাজকৃষ্ণ রায়	১৮৭৯
জাতীয় উচ্ছ্বাস	জলধর সেন	১৮৭৯
স্বদেশী পল্লীসংগীত	রজনীকান্ত পণ্ডিত	১৯০৫
মাতৃপূজা	এইচ,বসু	১৯০৬
হুংকার	হীরালাল সেনগুপ্ত	১৯০৯
বন্দনা	নলিনীরঞ্জন সরকার	১৯০৯
গান	বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি, বরিশাল	১৯২০
মাতৃমন্ত্র	–	১৯২০
মায়ের বোধন	–	১৯২০
মায়ের বাণী	–	১৯২০
স্বদেশগীতি	হরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	১৯২০
আমার বই	–	১৯২০
অর্ঘ্য	অরুণচন্দ্র গুহ	১৯২১
স্বদেশগাথা	অবিনাশ সরকার	১৯২১

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্জলি	চিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায়	১৯২১
স্বরাজ সংগীত	–	১৯২১
স্বরাজ সংগীত	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৯২১
স্বরাজ সংগীত ১ম	–	১৯২১, ঢাকা
দেশের গান	অক্ষয়শংকর দাশগুপ্ত	১৯২১
আনন্দ লহরী	হরেন্দ্রকুমার দাস	১৯২২
জাতীয় সংগীত	–	১৯২২
স্বদেশী গান	অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য	১৯২২

উপরের তালিকা থেকে বুঝা যায় সে সময় প্রচুর স্বদেশী গান রচিত হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলাকালে স্বদেশী সংগীত রচনায় প্রেরণা সঞ্চার করেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান। এছাড়া উল্লেখযোগ্য গীতিকার রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও অতুলপ্রসাদ সেনের গান সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ঃ হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে ঠাকুরবাড়িতে স্বদেশী সংগীত রচনার একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান লেখা শুরু করেন এবং একই সাথে হিন্দু মেলাকে ঘিরে দেশব্যাপী দেশাত্মবোধক সংগীত রচনার জোয়ার সৃষ্টি হয়। সে পটভূমিতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশ পর্যায়ের গান লেখা শুরু হয়। ১৮৮৬ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয় কলকাতা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখা 'মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি গেয়ে শোনান। একই বছর 'আগে চল আগে চল ভাই' 'তবু সপিতে পারিনে প্রাণ' গান দুটিও রচনা করেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে ১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের দেয়া সুরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) 'বন্দেমাতরম্' গানটি পরিবেশন করেন। তখন থেকেই এই গানটি বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে ১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ 'অয়ো ভুবন মনোমোহিনী' গানটি নিজেই গেয়ে শোনান।[১৩]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেক দেশবরেণ্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ সেদিন রাখী বন্ধন উৎসব প্রবর্তন করেছিলেন। রাখীবন্ধন উৎসব স্বদেশী সঙ্গীত রচনায় অভাবনীয় অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছিল। রবীন্দ্রনাথের এই গানটি তখন রাখীবন্ধন উৎসবের জনপ্রিয় গানে পরিণত হয়।

'বাংলার মাটি বাংলার জল'[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথের গান দেশপ্রেমের চিরন্তন ভাবটি ধারণ করেছে বলেই সেগুলো যুগের সীমা অতিক্রম করে চিরকালীন দেশাত্মবোধক গানের মর্যাদা পেয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) ঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালের একজন উল্লেখযোগ্য গীতিকার, সুরকার, গায়ক হচ্ছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। এসময় তিনি অসংখ্য উদ্দীপনামূলক দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন, নিজেই সুর দেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গেয়ে শোনান। দেশাত্মবোধক গানের বিষয় নির্বাচনে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) প্রমুখ পূর্বসূরীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন। গতানুগতিক দেশপ্রেমমূলক বিষয় তাঁর গানের উপজীব্য বিষয়। কিন্তু সুর যোজনার ব্যাপারে তিনি ব্যতিক্রমী পন্থা গ্রহণ করেছেন। রাগসঙ্গীত এবং পাশ্চাত্য সুরের মিশ্রণ ঘটিয়ে সুরের উদ্দীপনায় গানে নতুন আমেজ এনেছেন। কালিদাস রায় দ্বিজেন্দ্রলালের এই সুর প্রয়োগের নূতন পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন,

"সংগীতের এই প্রাণোচ্ছল শক্তি আমাদের দেশে ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল এই প্রাণশক্তি ইউরোপীয় সংগীত থেকে আত্মসাৎ করে বাংলা গানে সঞ্চার করেছেন। এই গীতগুলির অধিকাংশই কোরাস গর্ভ গীত। এই গানগুলি যখন নানা রঙ্গমঞ্চে গাওয়া হত তাতে উদাত্ত গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হত। যে সভামন্ডপে গাওয়া হত সে মন্ডপ যেন গম্বুজতলের মত গম গম করত, যে পথে গাওয়া হত সে পথ যেন সুরগঙ্গায় পরিণত হত"।[১৫] দ্বিজেন্দ্রলালের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্বদেশী গান যেমন- 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা', 'সেদিন সুনীল জলধি হইতে', 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ', 'আজি গো তোমার চরণে জননী আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান' প্রভৃতি গান সমকালীন সময়ে এতটাই উদ্দীপনাময় ছিল যে এগুলো জনপ্রিয়তায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দেমাতরম্' গানের সমপর্যায়ে পৌঁছেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানগুলো ভাব, ভাষা, সুরের ঐশ্বর্যে চিরকালীন দেশাত্মবোধক গানে পরিণত হয়েছে।

এই গানগুলির প্রত্যেকটিই জাতীয় ভাবউদ্দীপনায় যে সহায়তা করেছে বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্ ছাড়া অন্য কোন গান তা করে নি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা গীতসাহিত্যের যদি কোন অবদান থাকে তবে তার বেশীর ভাগ কীর্তির শিরোপা প্রাপ্য এই সকল গানের রচয়িতার।"

Dhaka University Institutional Repository

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) ঃ স্বদেশী আন্দোলনকে সার্থক করবার কাজে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন রজনীকান্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে জনগণ যখন বিদেশী পণ্যের বদলে দেশী পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন বোম্বাই, আহমেদাবাদ প্রভৃতি দেশীয় কাপড়ের কল মোটা কাপড় বয়ন করতে লাগল। কিন্তু বিদেশী মিহি কাপড়ে অভ্যস্ত জনগণ এই মোটা কাপড়কে সানন্দে গ্রহণ করতে পারলো না। তখন রাজশাহীর পল্লীবাসী কবি বাঙালীর মোহমুক্তি ঘটাবার মানসে গান রচনা করেন-

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই[১৬]

এই গান বাংলার ঘরে ঘরে, প্রতিটি বাঙালীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল। এই গানের মাধ্যমে বাঙালী নতুন ভাবে নিজেকে চিনতে পারল। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "গানটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ইতিহাসে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। এই একটিমাত্র গানই বাঙ্গালীকে দেশজ শিল্পের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিতে সাহায্য করে"।[১৭] দেশীয় পণ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছে এমন আরো কিছু গান রজনীকান্ত লিখেছেন। যেমন-

১. তাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত
২. আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট
৩. রে তাতী ভাই, একটা কথা মন লাগিয়ে শুনিস

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির আহ্বান জানিয়ে তিনি লেখেন 'আয় ছুটে ভাই হিন্দু মুসলমান'[১৮] গানটি। 'আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট' ও 'ফুলার কল্লে হুকুম জারি' গান দুটি ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল।[১৯] বঙ্গভঙ্গ যুগের পূর্ব থেকেই রজনীকান্ত এ ধরণের গান লিখেছেন। ১৯০২ সালে প্রকাশিত 'বাণী' কাব্যে তাঁর গভীর দেশবোধ প্রকাশক কয়েকটি গান রয়েছে। যেমন–

১. ভারতকাব্য নিকুঞ্জে জাগ সুমঙ্গলময়ী মা
২. তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণীসরসা
৩. জয় জয় জন্মভূমি জননী
৪. শ্যামল-শস্য-ভরা!
৫. নমো নমো নমো জননী বঙ্গ!

Dhaka University Institutional Repository

অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) ঃ

অতুলপ্রসাদের একটি মাত্র গীতিকাব্যগ্রন্থ 'গীতিগুঞ্জ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবি ও গীতিকার রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।[২০] গীতিগুঞ্জের গানগুলিকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে।– দেবতা, প্রকৃতি, স্বদেশ, মানব, বিবিধ।[২১] তাঁর সকল প্রকার গানই ভক্তিভাবে আদ্র। ধর্মকে ছাড়া খাঁটি স্বদেশ সঙ্গীত হয় না এর প্রমাণ তিনি দিয়েছেন তার সকল স্বদেশ সঙ্গীতে। ঈশ্বরপ্রেমে বিগলিত ভক্তিসঙ্গীত ও বেদনার্ত প্রেমসঙ্গীতের জন্যও তিনি বিখ্যাত। তাঁর কিছু গান স্বদেশী যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এমন কয়েকটি গানের উল্লেখ করা হলো।

উঠ গো ভারতলক্ষ্মী
বলো বলো বলো সবে, শত বীণা-বেণু রবে
হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর
মোদের গরব মোদের আশা
পরের শিকল ভাঙিস পরে, নিজের নিগড় ভাঙরে ভাই

মানসী মুখোপাধ্যায় 'অতুলপ্রসাদ' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, "স্বদেশসঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের নাম একেবারে প্রথম সারিতে। নজরুলও বহু স্বদেশ সঙ্গীত রচনা করেছেন এবং তাঁর 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' গানটি অবিস্মরণীয়। শৌর্য-বীর্য-ওজঃগুণে দ্বিজেন্দ্রলাল অনন্য সাধারণ; নজরুলের গানেও ওজঃগুণ বর্তমান। কিন্তু অতুলপ্রসাদের দেশমাতৃকার বন্দনা গান সহজতায়, মধুরতায়, ভক্তির প্রগাঢ়তায় অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী।"[২২]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যেমন বিপুল সংখ্যক দেশাত্মবোধক গান রচিত হয়েছে, আন্দোলন পরবর্তী পর্যায়ে (১৯১১) এসে দেখা যায় এসকল গানের ক্ষেত্রে গভীর শূন্যতা দেখা দিয়েছে। এক মুকুন্দ দাস ছাড়া অপর কোন প্রধান বাঙালী রচয়িতা দেশাত্মবোধক গান রচনায় সক্রিয় ছিলেন না। কারণ হিসেবে বলা যায় গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তাঁরা তেমন উৎসাহী ছিলেন না। স্বদেশী সংগীত রচিত না হওয়ার আরো একটি মুখ্য কারণ ছিল। স্বদেশী সংগীতের মুখ্য রচয়িতাদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ১৯০৭ সালে, রজনীকান্ত সেন ১৯১০ সালে, দ্বিজেন্দ্রলাল ১৯১৩ সালে পরলোকগমন করেন। অতুলপ্রসাদ স্বদেশী গান রচনার ধারা ত্যাগ করে ভিন্নতর সংগীতসৃজনে নিয়োজিত। স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান সংগীত রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশাত্মবোধক গান রচনার ধারা প্রায় ত্যাগ করেছেন।[২৩] ১৯১১ সালে রচিত 'জনগণমন অধিনায়ক' ও ১৯১৭ সালে রচিত 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গান দুটি ছাড়া তিনি এসময়

Dhaka University Institutional Repository

আর কোন উল্লেখযোগ্য স্বদেশী গান রচনা করেননি।[২৪] ফলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা দেশাত্মবোধক সংগীত রচনায় গভীর শূন্যতা দেখা দেয়। একমাত্র অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র রেখে চলেছিলেন মুকুন্দ দাস।

মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪) ঃ ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সময়ে চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান সারাদেশের মানুষকে পরাধীনতার বিরুদ্ধে উদ্দীপিত করেছে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গানের মাধ্যমে দেশবাসীকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা, বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ – এই সংকল্পকে বাস্তবায়ন করা। তাঁর গানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পংক্তি হচ্ছে –

১. ছিল ধান গোলা ভরা শ্বেত ইঁদুরে করল সারা[২৫]
২. দশ হাজার প্রাণ যদি আমি পেতাম
তবে বিদেশী বণিকের গৌরব রবি
অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম।[২৬]
৩. ভয় কি মরণে
রাখিতে সন্তানে মাতঙ্গী মেতেছে আজ, সমর রঙ্গে[২৭]
৪. জাগ গো জাগ জননী
তুই না জাগিলে শ্যামা, কেউ তো জাগিবে না মা,[২৮]

তিনি স্বরচিত গান যাত্রাভিনয়ের মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে গেয়ে বেড়াতেন। জয়গুরু গোস্বামী বলেছেন, মুকুন্দ দাস যখন গাইতেন 'দশ হাজার প্রাণ যদি আমি পেতাম' তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার যুবক এগিয়ে আসত ঐ দশ হাজারীর দলে যোগ দিতে।[২৯] তিনি অন্যান্য গীতিকারদের জনপ্রিয় গানও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাইতেন। ১৯২১ সালে প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশনে যখন বরিশালে হয়, তখন মুকুন্দ দাস মঞ্চে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে গাইলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান।

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলরে।[৩০]

মনোমোহন বসুর লেখা গান গেয়ে নারীদের উদ্দেশ্যে বলেন–

"ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি, বঙ্গনারী
কভু হাতে আর পরো না।
জাগ গো ও জননী, ও ভগিনী
মোহের ঘুমে আর থেকো না;

Dhaka University Institutional Repository

তখন অনুতাপ-অনুশোচনায় হাতের রেশমী চুড়ি ভেঙ্গে বা ছুঁড়ে ফেলতেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বঙ্গনারীরা।[৩১]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে বাংলা স্বদেশী গানের ধারা যখন ক্ষীয়মান হয়ে এসেছে, দেশব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রাম বেগবান হচ্ছে, অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে এই প্রেক্ষাপটে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা গানের জগতে আবির্ভূত হন।

রাজ্যেশ্বর মিত্র 'বাংলা সঙ্গীতে নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধে লিখেছেন, "বাংলার সাঙ্গীতিক ইতিহাসে দেখা গেছে যখনই বন্ধ্যাযুগ এসে গেছে বা সঙ্গীতে বিকৃতির আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়েছে তখনই এক বা একাধিক প্রতিভাবান রচয়িতা এসে সেই যুগকে উদ্ধার করেছেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ যুগে এলেন নিধু বাবু, রাধামোহন সেন, কালী মীর্জা প্রমুখ কৃতীবিদ্য ব্যক্তি, উনবিংশ শতাব্দীতে গিরিশচন্দ্র একটি বৃহৎ প্রেরণা প্রদান করেছিলেন এবং শেষভাগে উদিত হলেন রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ। তারা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত কলকাতা জুড়ে ছিলেন। এর মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হল, রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে, রজনীকান্ত সেনও গত হলেন, শেষ পর্যন্ত অতুল প্রসাদ সেনও উত্তর প্রদেশের লখনউ শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন। সঙ্গীতের দিক থেকে কলকাতায় একটা শূন্যতা নেমে এল। এই সময় দেখা যায় প্রচলিত নানান ধরনের গান এবং থিয়েটারের গান কলকাতা তথা তাবৎ বাংলায় পরিব্যাপ্ত হয়েছিল এটা সঙ্গীতের একঘেয়ে যুগ। ..... সময়টা যখন এই রকম তখন সহসা ঘটল নজরুল ইসলামের আবির্ভাব।"[৩২]

স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম রূপকার কাজী নজরুল ইসলামের গানে পাওয়া যায় সাধারণ জনগণের প্রত্যক্ষ বাস্তব অবস্থার চিত্র; সমাজ পরিবর্তনে এগিয়ে আসার বিপ্লবী আহবান। নজরুলের সমসাময়িক রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য প্রধান গীতিকারদের লেখায় গণমানুষের মুক্তির কথা, জাতীয় জাগরণের উদাত্ত আহ্বান রয়েছে ঠিকই কিন্তু তাঁদের লেখায় নেই বিপ্লবী চেতনা। দেশের গরীব-দুঃখী সাধারণ জনগণের সাথে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তাঁদের ছিল না। নজরুলই একমাত্র কবি যিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। সাধারণ জনগণের সাথে ছিল তাঁর সরাসরি যোগাযোগ। শ্রেণীগত অবস্থানে তিনি ছিলেন তাদেরই একজন। শৈশবের কঠিন জীবন সংগ্রাম তাঁর কবিমানস গঠনে সহায়ক হয়েছে। বাংলা গানে গণমানুষের মুক্তির কথা এতটা সোচ্চারভাবে তাঁর আগে আর কেউ উচ্চারণ করেননি। পরাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি লিখেছেন তেমনি সমাজের শোষিত মানুষ যেমন কৃষক, শ্রমিক, নারী, জেলে, তাঁতী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মানুষের মুক্তির গান লিখেছেন, গেয়েছেনও।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. আনোয়ারুল করিম, বাউল সাহিত্য ও বাউল গান, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭১, পৃ. ২২৮

২. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) 'মাতৃবন্দনা' (১৯৬৩) গ্রন্থের ভূমিকা, উদ্ধৃত অরুণকুমার বসু, বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্র সঙ্গীত, কলিকাতা ১৯৭৮, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৯৩-১৯৪

৩. অরুণকুমার বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

৪. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পাদিত), রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৩ পৃ. ৩৫২

৫. গীতা চট্টোপাধ্যায়, বাংলা স্বদেশী গান, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী ১৯৮৩, পৃ. ix

৬. অরুণকুমার বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪

৭. করুণাময় গোস্বামী, বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের গান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৫৫

৮. সুশীলকুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিতমানস, দেশ পাবলিশিং, কলিকাতা, ২য় সং., ১৩৯৫, পৃ. ৩৪৭

৯. যোগেশচন্দ্র বাগল, হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত, মৈত্রী, কলিকাতা, ১ম প্রকাশ ১৩৫২, পৃ. ১১২

১০. অরুণকুমার বসু, পূর্বোক্ত পৃ. ১৯৫

১১. যোগেশচন্দ্র বাগল, হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩

১২. অরুণকুমার বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯-২০০

১৩. করুণাময় গোস্বামী, রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৮৭

১৪. গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১৪৩

১৫. রবীন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদিত) দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ১ম খ., কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৬, ভূমিকা পৃ. ৫১

১৬. প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত) কান্তকবি রচনাসম্ভার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১৯. করুণাময় গোস্বামী, বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯০, পৃ. ১২০

২০. মানসী মুখোপাধ্যায়, অতুলপ্রসাদ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ভূমিকা চ

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

২২. মানসী মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

২৩. করুণাময় গোস্বামী, বাংলা গানের বিবর্তন, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৯০

২৪. করুণাময় গোস্বামী, রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিক্রমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

২৫. জয়গুরু গোস্বামী, চারণকবি মুকুন্দ দাস, বিশ্ববাণী, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ২৩৪

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৩২. কল্পতরু সেনগুপ্ত, নজরুলগীতি আলোচনা, উদ্ধৃত রফিকুল ইসলাম নজরুল প্রসঙ্গে, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

নজরুলের দেশ-কাল-পটভূমি

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার (১৭৩৩-১৭৫৭) পরাজয়ের ফলে পাক-ভারত উপমহাদেশ পর্যায়ক্রমে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মুসলমানদের জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। ইংরেজদের প্রশাসনিক আইন ও শিক্ষানীতির ফলে অভিজাত শ্রেণীটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ওয়াকিল আহমদের মতে "১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ে রাজক্ষমতাচ্যুতি, ১৯৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারীর সংখ্যা হ্রাস, ১৮২৮ সালে বাজেয়াপ্ত আইনে নিষ্কর ভূমির রায়তিস্বত্ব লোপ এবং ১৮৩৭ সালে ফারসীর রাজভাষাচ্যুতি পরপর এই চারটি বড় আঘাতে পূর্বের শাসকশ্রেণী নিঃস্ব রিক্ত নিরক্ষর নিষ্ক্রিয় নির্জীব জাতিতে পরিণত হয়"।[১] কৃষক, শ্রমিক নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা এসব আইনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তবে কোম্পানীর শোষণনীতি থেকে তারাও রেহাই পায়নি। কোম্পানী এদেশের কুটিরশিল্প ধ্বংস করে বিদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্যে। কোম্পানীর বাণিজ্য নীতির ফলে তাঁতী সর্বস্বান্ত হয়। নীলচাষে কৃষকের সর্বনাশ ঘটে। মোটকথা, নিম্নবিত্তের মানুষ রোগব্যাধি ও দুর্ভিক্ষ, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে আরও দরিদ্র হয়েছে। আধুনিক জীবনের ফল তারা কিছুই পায়নি।[২] প্রায় দেড়শ বছরের শোষণ-বঞ্চনার শিকার হয়ে মুসলমানরা যখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এরূপ সামাজিক পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের শেষে কাজী নজরুল ইসলাম এক সম্ভ্রান্ত দরিদ্র মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) জন্ম বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে, ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যেষ্ঠ, মঙ্গলবার, ২৪শে মে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে। পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ, মাতার নাম জাহেদা খাতুন। নজরুলের পিতা মৃত্যুবরণ করেন ১৩১৪ সালের ৭ই চৈত্র (১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে)। নজরুলের বয়স তখন মাত্র নয় বছর। তখন থেকেই শুরু হয় তার জীবন সংগ্রাম। আর্থিক অনটনের কারণে ১৯০৯ সালে গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ওই মক্তবেই এক বৎসরকাল শিক্ষকতা করেন। একই সাথে এলাকার মাজারে খাদেমগিরি ও মসজিদে ইমামতিও করেন। এর পরবর্তীতে দশ বৎসর বয়সে তিনি লেটো দলে যোগ দেন। লেটোর দল পরিত্যাগ করে সম্ভবত ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে নজরুল বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার মাথরুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ষষ্ঠ

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীতে পড়াকালীন তাঁর স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয় সম্ভবত আর্থিক কারণেই। এরপর তিনি জনৈক বাসুদেবের কবিগানের দলে যোগ দেন। সেখানে গানের মহড়ায় তাঁর গান শুনে বর্ধমানের আন্ডাল ব্রাঞ্চ রেলওয়ের একজন খ্রিষ্টান গার্ড তাঁকে খানসামার চাকুরী দেন। মাস দুয়েক অবস্থান করার পর সেখান থেকে পালিয়ে চলে আসেন আসানসোলে। এক রুটির দোকানে মাসিক এক টাকা বেতনে তাঁর চাকরী হয়। সেখানে তিনি জনৈক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর কাজী রফিজউল্লাহর নজরে পড়েন। ১৯১৪ সালে তিনি তাঁকে তাঁর নিজ গ্রাম ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার কাজীর শিমলা গ্রামে নিয়ে যান এবং নিকটবর্তী দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত হয়ে নজরুল সেখান থেকে দেশে ফিরে আসেন। এপর তিনি ভর্তি হন রাণীগঞ্জে সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে। ১৯১৭ সালে নজরুল যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র, প্রি-টেস্ট পরীক্ষা চলছে, বাঙালী পল্টনে সৈন্য নেওয়া হচ্ছে শুনে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।[৩]

বাল্য ও কৈশোরের কঠিন জীবন সংগ্রামই তাঁকে ভবিষ্যৎ জীবনে সাধারণ মানুষকে বুঝতে তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে সাহায্য করেছে। শৈশবের পারিবারিক প্রেক্ষাপট তাঁর মানস গঠনে সহায়তা করেছে তেমনি সমসাময়িক আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও তাঁর কবি-মাস গঠনে প্রভাব ফেলেছে।

উনিশ শতকের শেষে বৃটিশ সাম্রাজ্য এক সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। একদিকে ফরাসী ও রুশ সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অন্যদিকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য বিস্তার এবং পশ্চিমে আমেরিকা ও প্রাচ্যে জাপানের মত দুটি নতুন শক্তির উত্থান ঘটে। এই সংকটময় মুহূর্তে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ক্ষয়িষ্ণু দশা থেকে উত্তরণে সাহায্য করতে চাইলেন ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন (১৮৫৯-১৯২৫)। ভারত সচিবের সহকারীরূপে তাঁর হাত দিয়ে ১৮৯২ সালের শাসন সংস্কার আইন পাশ হয়েছিল। তখন থেকেই তিনি কংগ্রেসবিরোধী, হিন্দুবিরোধী, কিছুটা বাঙালীবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যান।[৪] পরবর্তীতে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা পৌরসভা আইন ও ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রবর্তন করে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারী কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হন।[৫]

কার্জনের বিভিন্ন কর্মকান্ডে ভারতবাসীর মনে অসন্তোষ ক্রমশঃ ঘণীভূত হচ্ছিল এর চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটল বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করার আগে বঙ্গ বা বাংলা বলতে

Dhaka University Institutional Repository

বুঝাত অভিভক্ত বাংলা, সম্পূর্ণ বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম। এরকম বিস্তৃত একটি অঞ্চল শাসন করা দুরূহ ব্যাপার। তাই প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে ১৯০৫ সালের ৯ জুন ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে গঠিত হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ; এর রাজধানী হয় ঢাকা। এ সময় এ দেশের জনসংখ্যা ছিল তিন কোটি দশ লক্ষ। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ছিল এক কোটি আশি লক্ষ।[৬]

১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগকে প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে চিত্রিত করার প্রচেষ্টা বহুদিনের। কিন্তু এর মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। এমাজউদ্দীন আহমদ '১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ' শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিষদভাবে আলোকপাত করেছেন। বিশ শতকের প্রথম দিকে বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ভারতের জনমনে যে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয় সে প্রেক্ষিতে ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগের মূল উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করলে বঙ্গ বিভাগের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই প্রধান বলে মনে হয়।[৭] বিশ শতকের শুরুতে ব্রিটিশ সরকার ভারতের জনগণের মনে নতুন চিন্তা চেতনার বিকাশ লক্ষ্য করে শঙ্কিত হয়। এ শঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশাসক ও রাজনৈতিক নেতার বক্তব্যে।

১৮৯৯ সালে ভারত সচিব ফ্রান্সিস হ্যামিলটন কার্জনের নিকট লেখা এক পত্রে বলেন, "আমার মনে হয় আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর ভারতে আমাদের শাসনের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা হয়ে যা দেখা দেবে তা হ'ল পাশ্চাত্যের ঢংএ আন্দোলন সংগঠনের পর্যায়ক্রমিক অথবা ব্যাপক বিস্তার। আমরা যদি শিক্ষিত হিন্দুদের ভিন্নমুখী ভাবধারার দু'টি দলে বিভক্ত করতে পারি তবে উত্তরোত্তর উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের ফলে আমাদের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যে সূক্ষ্ম আক্রমণ আসছে তা প্রতিহত করতে পারব।"[৮]

এমাজউদ্দীন আহমেদ মন্তব্য করেছেন, "বিশ শতকের প্রারম্ভে বৃটিশ কর্মকর্তারা ভারতের দু'প্রান্ত থেকে সদ্যজাগ্রত ও ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদের মৃদুগুঞ্জন শুনতে পান। পূর্ব প্রান্তে বাঙালী 'ভদ্রলোকদের' অভূতপূর্ব প্রভাব আর দক্ষিণে মারাঠা ব্রাহ্মণদের যুদ্ধংদেহী মনোভাব বৃটিশ কর্মকর্তাদের ভয়ঙ্করভাবে শঙ্কিত করে তোলে।[৯] বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনার রাজনৈতিক দিকটি স্পষ্টভাবে উন্মোচিত হয়েছে স্বরাষ্ট্র সচিব রিজলীর বক্তব্যে। বঙ্গবিভাগের পক্ষে প্রশাসনিক যুক্তির অন্তঃসারশূন্যতা স্পষ্টভাবেই সবার চোখে পড়ে। সারা বাংলার পত্র-পত্রিকা, সভা-সমিতি এর

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। কার্জন এই প্রতিবাদের উত্তর দেবার জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। রিজলী বঙ্গবাসীদের প্রতিবাদের উত্তরে যা বলেন তার মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক দিকটি উন্মোচিত হয়েছে তাঁর বক্তব্যের এই অংশে। তিনি বলেন, "অবিভক্ত বাংলা একটি শক্তি। বাংলা বিভক্ত হলে তা বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হবে। এটা সত্য আর এ পরিকল্পনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হ'ল এই। স্বরাষ্ট্র সচিব (বঙ্গবাসীদের প্রতিবাদের) আর বেশী কিছু বলতে অক্ষম। তবে সততার সীমা লংঘন করেও এটা বলব বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনা ঘনবসিতপূর্ণ পূর্ব বাংলাকে আসামের দিকে প্রসারিত হবার সুযোগ দান করবে। ফলে বাঙ্গালী জাতির জন্য অধিকতর সুযোগ নিশ্চিত হবে"।[১০]

বঙ্গবিভাগের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অনুধাবন করে দেশব্যাপী এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। বঙ্গভঙ্গের সরকারী প্রস্তাব প্রকাশিত হবার আগেই 'সঞ্জিবনী' বিদেশী পণ্য বর্জনের ডাক দেয়। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকর হয়। সেদিন 'বন্দেমাতরম্' ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীত গেয়ে গেয়ে দলে দলে সব বয়সী লোক রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তারা অরন্ধন ও রাখীবন্ধনের মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত করল। এই সময় স্বদেশী কাপড়ের কল, উন্নত তাঁত, চীনামাটি, চামড়া, দেশলাই ও সাবানের কারখানা, এমনকি জাহাজ নির্মাণের উদ্যোগ গড়ে ওঠে। স্বেচ্ছাসেবীর দল মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় বাড়ি বাড়ি ফেরী করত।[১১] রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের শোভাযাত্রায় যোগ দেন। সম্মিলিত কণ্ঠে গান 'বাংলার মাটি বাংলার জল' এবং 'ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে'। তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় লিখলেন "আগামী ৩০শে আশ্বিন [১৩১২] বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙালির রাখি বন্ধনের দিন বলিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। রাখি-বন্ধনের মন্ত্রটি এই, ভাই ভাই এক ঠাঁই।"[১২]

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিলাতী পণ্য বর্জনের যে আন্দোলন গড়ে উঠলো রবীন্দ্রনাথ তা সমর্থন করেননি। 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বয়কট নীতির তীব্র সমালোচনা করলেন, '.....আমাদের দেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যথাসম্ভব বিলাতি জিনিস কেনা বন্ধ করিয়া দেশী জিনিস কিনিবার জন্য যে সংকল্প করিয়াছিল সেই সংকল্পটিকে

Dhaka University Institutional Repository

স্তব্ধভাবে, গভীরভাবে, স্থায়ী মঙ্গলের উপরে স্থাপিত করিতে হইবে। আমি আমাদের এই বর্তমান উদযোগটির সম্বন্ধে যদি আনন্দ অনুভব করি তবে তাহার কারণ এই যে, তাহাতে ইংরেজের ক্ষতি হইবে, তাহার কারণ সম্পূর্ণভাবে এও নহে যে তাহাতে আমাদের দেশী ব্যবসায়ীদের লাভ হইবে–এ সমস্ত লাভ ক্ষতি নানা বাহিরের অবস্থার উপরে নির্ভর করে–সে সমস্ত সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখা আমার ক্ষমতায় নাই। আমি আমাদের অন্তরের লাভের দিকটা দেখিতেছি।"[১৩]

১৯০৮ সাল থেকে বাংলাদেশে বিপ্লবীদের কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। রবীন্দ্রনাথ কখনো সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমকে সমর্থন করেননি। এসময় তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধে বয়কট, আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদের সমালোচনা করেন। তিনি 'সদুপায়' প্রবন্ধে বলেছেন, "আমরা ধৈর্য হারাইয়া, সাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সুবিধা-অসুবিধা বিচারমাত্র না করিয়া বিলাতী লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কার সাধনের কাছে আর কোন ভালমন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না। ক্রমশঃ লোকের সম্মতিকে জয় করিয়া লইবার বিলম্ব আমরা সহিতে পারিলাম না, ইংরেজকে হাতে হাতে তাহার কর্মফল দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।"[১৪]

স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে জনমত সংগঠনের জন্য জেলায় জেলায় সমিতি স্থাপিত হয়; স্বেচ্ছাসেবী দল গড়ে ওঠে। এ সকল সমিতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বরিশালের 'স্বদেশ বান্ধব', ফরিদপুরের 'ব্রতী', মৈমনসিংহের 'সুহৃদ' (ও 'সাধনা') আর সবচেয়ে বিখ্যাত ঢাকার 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন'। জেলা সমিতির অধীনে অনেক শাখাও গড়ে ওঠে।[১৫] যুবকদের নৈতিক শিক্ষা স্বদেশপ্রেম এবং সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শক্তি অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এ সকল সংগঠন গড়ে উঠলেও এগুলো পরবর্তীতে আন্দোলন সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। এ সকল সংগঠনকে ইংরেজ সরকার বিপ্লবী দল হিসেবেই মনে করেছিল। এর স্বপক্ষে যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

১৯২২ সালে নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' যাকে উৎসর্গ করে লেখা সেই বারীন্দ্রকুমার (১৮৭০-১৯৫৯) ছিলেন 'অনুশীলন' দলের নেতা। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য ক্ষুদিরাম (১৮৮৯-১৯০৮) ও প্রফুল চাকী (১৮৮৮-১৯০৮) ভুল করে বোমা নিক্ষেপ করেন মজঃফরপুরের নেতৃস্থানীয় আইনজীবী প্রিঙ্গল কেনেডীর স্ত্রী মিসেস কেনেডী এবং তার কন্যা মিস কেনেডীর গাড়িতে। এই ঘটনায় মিসেস কেনেডী এবং মিস কেনেডী নিহত হন। অতঃপর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে প্রফুল্ল চাকী আত্মঘাতী হল (১লা মে,

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৮)। ক্ষুদিরামের কাছ থেকে পুলিশ গোপন আন্দোলনের তথ্যাদি উদ্ধার করে। পুলিশ ২রা মে কলিকাতার মানিকতলায় একটি বাড়িতে হানা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যসহ বারীন্দ্রকুমার এবং তার সহকর্মীদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের সাথে সাথে তিনি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেন এবং বিপ্লব প্রচেষ্টার সকল তথ্য প্রকাশ করে বলেন My mission is over. বিচারে তাঁর ফাঁসীর আদেশ হয়। পরে আপীলে যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়। ১৯০৯ থেকে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আন্দামানে কারারুদ্ধ ছিলেন।[১৬]

ইংরেজ সরকার এই ঘটনাকে সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যায়িত করলো। এর পক্ষের রাজনীতিবিদেরাও ঘটনাটাকে সেভাবেই ব্যাখ্যা করলো। পক্ষের লোকেরা বললো এটা বিপ্লব প্রচেষ্টা। মজঃফরপুরের ঘটনার পর ইংরেজ সরকার 'অনুশীলন দলের' মত আরও যে সব সংগঠন গড়ে উঠেছিল সে সব সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে (১৯০৯)। 'অনুশীলন দল' কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা করে এর পিছনের কারণ ছিল এরকম-সে সময় বঙ্গভঙ্গ নিয়ে তুমুল আন্দোলন চলছিল। রাজদ্রোহের অনেকগুলি মামলার বিচার করেছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড। তিনি সুশীল নামে একটি চৌদ্দ বছরের কিশোরকে চৌদ্দটি বেত্রাঘাতের আদেশ দিয়েছিলেন। এর প্রতিশোধ হিসেবে তাকে হত্যা করার চেষ্টা নেওয়া হয়। একাজে বগুড়ার প্রফুল্ল চাকী আর মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসুকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সন্ত্রাসবাদী বলে কথিত এসকল রাজনৈতিক দল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ প্রভৃতি রাজনৈতিক সংগঠনের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যর্থতায় বিরূপ হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। এরা ইটালীর কারনারী, রাশিয়ার নিহিলিষ্ট, আয়ারল্যান্ডের সিনফিন আন্দোলনকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করেছে।[১৭]

১৯০৭ সালে কংগ্রেসের আন্দোলনের প্রকৃতি নিয়ে সুরাট কংগ্রেসে বিরাট মতবিরোধ দেখা দেয় এবং কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নরমপন্থীরা ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন চায়। চরমপন্থীরা চায় পূর্ণ স্বাধীনতা ১৯১৯ সালে মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসেন। তিনি নরমপন্থীদের দলে যোগ দেন। বলাবাহুল্য কংগ্রেস বরাবরই নরমপন্থীদের দখলে ছিল। গান্ধী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকারের পক্ষ থেকে ভারতবাসীকে সৈন্যদলে ভর্তি হওয়ার আহবান জানান। ভারতবাসীর সৈন্যদলে যোগ দেওয়া উচিত কিনা এ ব্যাপারে কংগ্রেসের মতবিরোধ দেখা দেয়। অধিকাংশ

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যের মত ছিল ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করার। কংগ্রেস প্রস্তাব নেয় (১৯১৪-১৫) তারা যেভাবে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছে ও সহযোগিতা করছে তার বিনিময়ে ভারতবাসী যেন যুদ্ধ শেষে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায় তা দেখা সরকারের কর্তব্য। এসময় অনেক চরমপন্থী নেতাও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে কথা বলেন।[১৮]

১৯১৮ সালে মন্টেগু ও চেমসফোর্ডের স্বাক্ষরিত ভারত শাসন আইনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পরের বছর তা আইনে পরিণত হয়। স্বায়ত্তশাসনের দাবী যখন জোড়দার হয়ে উঠছে তখন জনগণকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে এই আইনে সীমিত আকারে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দানের প্রচেষ্টা দেখানো হয়। এই আইনে সুপারিশ করা হয়েছিল শাসন ব্যবস্থার প্রতি বিভাগে ভারতীয়দের বেশী করে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে এবং ভারতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমোন্নতি ঘটানো হবে।[১৯]

ভারত শাসন আইন হওয়ার পর ১৯১৯ সালে রাউলাট বিল পাশ হয়। এই কুখ্যাত বিলের মূল কথা যে কোন লোককে রাজনৈতিক কারণে বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখা। কোন ব্যক্তিকে সন্দেহ করা হলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করে বিশেষ আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া বিচার করা যাবে। বিচারের পর আপীল করা চলবে না। যে কারো উপর যাতায়াতের বিধি-নিষেধ আরোপ করা যাবে এবং বিনা ওয়ারেন্ট যে কোন ব্যক্তির বাড়ি তল্লাসী করা যাবে। রাউলাট বিলের প্রতিবাদে কংগ্রেস থেকে সত্যাগ্রহ ও হরতালের ডাক দেওয়া হয়। ৬ই এপ্রিল হরতাল ডাকা হয়। স্থির হয় তা হবে আইন অমান্য আন্দোলনের ভূমিকা। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির কারণে হরতালের আগেই দিল্লীতে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। রাউলার্ট বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে পাঁচজন নিহত হয়।[২০]

১৮ই এপ্রিল ১৯১৯ তারিখে গান্ধী সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করে নিলেন। পাঞ্জাবের উপর অত্যাচারের, বিশেষ করে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের পর ইংরেজ ও ভারতবাসীদের মধ্যে যে সংঘর্ষের পথ সৃষ্টি হল তা কালক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে চলে। বৃটিশ ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যবাদিতার উপর বিলীয়মান বিশ্বাস সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় ভিত ভেঙ্গে যায়।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল যখন সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করেন তখন এদেশে খেলাফত অসহযোগ আন্দোলন তুঙ্গে। 'ধূমকেতু' (১৯২২) পত্রিকায় নজরুলের রাজনৈতিক মতাদর্শের স্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায়। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন,

"আমার কর্ণধার আমি। আমার পথ দেখাবে আমার সত্য।"[২২] (আমার পথ)

"ধূমকেতু কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মানুষ ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য"।[২৩]

(আমার পথ)

"ধূমকেতুর মত হচ্ছে এই যে, তোমার মন যা চায় তাই কর। ধর্ম, সমাজ, রাজা, দেবতা কাউকে মেনো না। নিজের শাসন মেনে চলো।"[২৪]

(ধূমকেতুর পথ)

"একবার শির উঁচু করে বল দেখি বীর, মোরা সবাই স্বাধীন, মোরা সবাই রাজা।"[২৫]

(দুর্দিনের যাত্রী)

বল কারুর অধীনতা মানি না, বিদেশীরও, স্বদেশীরও না।"[২৬]

(দুর্দিনের যাত্রী)

নজরুল ধূমকেতুতে ঘোষণা করেছেন, "সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেন না, ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবের্ষর এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসন-ভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী করার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুঁটলি বেঁধে সাগরপাড়ে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন-নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করার ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।"[২৭]

নজরুল এমন এক সময়ে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার কথা পত্রিকায় লেখেন (সেটা ছিল ১৯২২ সাল) যখন গান্ধীজী ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের জন্য জোড় দাবী জানাচ্ছিলেন। ১৯২১ সালের শেষ

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তাহে অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেস ও অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন আহমদাবাদে হয়েছিল। কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে যে ইশতিহার বিতরণ করা হয় তাতে ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ছিল। কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই মাওলানা হসরৎ মোহানী (১৭৭৮-১৯৫১) উর্দু ভাষায় ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এর আগে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে কখনও পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। গান্ধীজীর তীব্র বিরোধিতায় প্রস্তাবটি পাশ হতে পারেনি। হসরৎ মোহানীর বিরুদ্ধে প্রস্তাবটি উত্থাপনের কারণে আহমদাবাদের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের (Indian Penal Code) ১২৪-এ ধারা (রাজদ্রোহ) ও ১২১ ধারার (সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা) মোকদ্দমা রুজু হল। রাজদ্রোহের মোকদ্দমায় তাঁর দুবছরের সশ্রম কারাদন্ড হয়।[২৮] নজরুলের লেখার সাথে মাওলানা হসরৎ মোহানীর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটির তুলনা চলে। হসরৎ মোহানীর দু'বছর কারাদণ্ড হওয়া সত্ত্বেও নজরুলই একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রকাশ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে লিখেছেন।

নজরুল তাঁর সব লেখাতেই বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন। তাঁর বহু লেখা বারবার রাজরোষে পড়েছে। তাঁর প্রথম যে বইটি নিষিদ্ধ হয়,তার নাম 'যুগবাণী' ১৯২২ সালে এটি বাজেয়াপ্ত হয়। 'বিশের বাঁশি' ও 'ভাঙার গান' বাজেয়াপ্ত হয় ১৯২৪ সালে।[২৯] 'প্রলয় শিখা' ১৯৩১ সালে।[৩০] 'চন্দ্রবিন্দু' ১৯৩১ সালে বাজেয়াপ্ত হয়।[৩১] নজরুলের লেখা এই পাঁচটি নিষিদ্ধ গ্রন্থ ছাড়া আরও অনেক লেখা রাজরোষে পড়েছিল যদিও সেগুলি শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়নি। যেমন অগ্নিবীণা, ফণিমনসা, সঞ্চিতা, সর্বহারা, রুদ্রমঙ্গল প্রভৃতি।[৩২] সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের নিয়ে তিনি লিখেছেন 'কুহেলিকা' উপন্যাস (পত্রিকায় প্রকাশকাল ১৩৩৪)। সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ড ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত চলেছিল। বিপ্লবীদের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী ছিল ১৯৩০ এর ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন; যে কর্মসূচী সফল করতে গিয়ে সূর্যসেনকে (১৮৯৩-১৯৩৪) ফাঁসিতে ঝুলতে হয়। নজরুলের লেখা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কাজে উৎসাহ যুগিয়েছে নিঃসন্দেহে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৩-৩৪

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৩. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও সাহিত্য, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৭-২০

৪. অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ৫ম মুদ্রণ, ১৪০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৫৬

৫. অতুলচন্দ্র রায, ভারতের ইতিহাস (২য় খ.)
মৌলিক লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৪৮১

৬. মুনতাসীর মামুন, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১২

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

১১. অমলেশ ত্রিপাঠী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খ., বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৭১, পৃ. ৬০৭-৬০৮

১৪. উদ্বৃত, সরোজ দত্ত ও অলোক রায়, রবীন্দ্রনাথের কালান্তর, বাগর্থ, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃ. ২৬

১৫. অমলেশ ত্রিপাঠী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

১৬. আতাউর রহমান, নজরুলঃ ঔপনিবেশিক সমাজে সংগ্রামী কবি, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৩

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

১৮. কমলকুমার সান্যাল, ভারতের স্বাধীনতা সংগামে সংগ্রামী কারা?, ১ম প্রকাশ ১৯৭৯, কান্তি রঞ্জন ঘোষ, কলকাতা, পৃ. ৪০-৪২

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

২১. অমলেশ ত্রিপাঠী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

২২. আবদুল কাদির (সম্পাদিত) নজরুল রচনাবলী, ১ম খ. (আমার পথ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৮৭০-৮৭১

২৩. নজরুল রচনাবলী ১ম খ. (আমার পথ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭০-৮৭১

২৪. প্রাগুক্ত, (ধূমকেতুর পথ), পৃ. ৮৭৮

২৫. প্রাগুক্ত, (দুর্দিনের যাত্রী) পৃ. ৮৫৭

২৬. প্রাগুক্ত, (দুর্দিনের যাত্রী) পৃ. ৮৫৮

২৭. প্রাগুক্ত, (ধূমকেতুর পথ) পৃ. ৮৭৬

২৮. মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২১৫-২১৬

২৯. শিশির কর, নিষিদ্ধ নজরুল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জুন ১৯৯৮, পৃ. ১১

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
নজরুল সঙ্গীতের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ

বাংলা গানের শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক এবং রাগভিত্তিক শ্রেণীকরণ এ দু'রকম পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। আবার এ দুটি'র মিশ্রণও অনেক ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। নজরুল সঙ্গীতের শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে এই মিশ্র পদ্ধতির প্রচলনই বেশী। এর প্রধান কারণ সম্ভবত এটা হতে পারে, নজরুল ইসলাম নিজেই তাঁর গানের শ্রেণীকরণ করে গেছেন এবং তাতে এই দুই পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটেছে। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত 'নজরুল-গীতিকা' শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত গানগুলির যে শ্রেণীবিন্যাস তিনি করেছেন তা হচ্ছে ওমর খৈয়ামগীতি, দীওয়ান-ই-হাফিজগীতি, জাতীয় সংগীত (দেশাত্মবোধক ও উদ্দীপনামূলক স্বদেশী গান), ঠুংরী, গজল, টপ্পা, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী, ধ্রুপদ, হাসির গান এবং খেয়াল।[১] এ প্রসঙ্গে রফিকুল ইসলাম বলেছেন, "…. ঐসব বিভিন্ন আঙ্গিকের গানে নজরুল কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী, আর হাসির গান ছাড়া সব শ্রেণীর গানের সুরকে রাগাশ্রয়ী করেছেন।[২] করুণাময় গোস্বামী মন্তব্য করেছন, ".....এই শ্রেণীকরণ প্রক্রিয়ায় নজরুল কোন একক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেননি। কেননা, এই প্রক্রিয়াটি কোন একক পদ্ধতিগত বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; উভয়ের মিশ্রণ"।[৩] নজরুল সঙ্গীতের সংকলকগণ শ্রেণীকরণ করতে গিয়ে এই মিশ্র পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। বিশুদ্ধ বিষয়ভিত্তিক বা রাগভিত্তিক শ্রেণীকরণ কেউই করতে পারেননি।

'নজরুলগীতি অখন্ড' সংকলনে আব্দুল আজীজ আল আমান সংকলিত গানগুলিকে এভাবে ভাগ করেছেন: কাব্যগীতি, রাগপ্রধান, ইসলামী, ভক্তিগীতি, গজল, লোকগীতি, দেশাত্মবোধক, হাসির গান, হিন্দী গান।[৪] গজল এবং রাগপ্রধান হচ্ছে সাংগীতিক শ্রেণী। ইসলামী, ভক্তিগীতি, লোকগীতি, হাসির গান বিষয়বস্তুগত, আর কাব্যগীতি প্রসঙ্গে বলা যায় অনেকে এই শিরোনামটি ব্যবহার করেছেন। যেমন নারায়ণ চৌধুরী 'নজরুল চর্চা' শীর্ষক গ্রন্থে শ্রেণীকরণ করেছেন এভাবে: গজল, কাব্যগীতি, রাগ প্রধান, বিদেশী সুরভঙ্গির গান, লোকগীতি, ভক্তিগীতি।[৫] 'কাজী নজরুলের গান' শীর্ষক গন্থে কাব্যগীতি প্রসঙ্গে আলোচনায় তিনি বলেছেন, "নজরুলের কাব্যগীতির সংখ্যা অজস্র। সাকুল্য গান সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী হবে অনুমান করা যায়। কাব্যগীতির মধ্যে প্রেমের গানই বেশী, তবে প্রকৃতি ও অন্যান্য বিষয়ক গানও কিছু কিছু আছে।"[৬]

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যগীতি বলতে কোন শ্রেণীর গানকে বুঝায় এ সম্পর্কে করুণাময় গোস্বামী তাঁর 'বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান' শীর্ষক গ্রন্থে বিষদভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর মতে, কাব্যগীতি বলতে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর গানকে বুঝায় না। যে গানে কাব্য ও সঙ্গীতের সম্মিলন ঘটে তাকেই বলে কাব্যগীতি। কাব্যগীতিতে কথাই মুখ্য, সুর গৌণ। গানের কথাকে সুরের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলাই এই শ্রেণীর গানের মূল উদ্দেশ্য। কাব্যগীতি রচিত হতে পারে প্রেম, প্রকৃতি বা অন্য যে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে। সঙ্গীতোপযোগী যে কোন বিষয় নিয়ে কাব্যগীতি রচিত হতে পারে। কাব্যগীতি কোন সঙ্গীত শ্রেণী নয়, এটি সঙ্গীতের একটি ধারা।[৭]

সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে দু'টি ধারা প্রচলিত। একটি বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আদর্শ অনুসরণ করে চলে। কথার চেয়ে সুরের কারুকার্যই এক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীত অবলম্বনে রচিত গান এই ধারার অন্তর্গত। অপর ধারাটিতে গানের বাণীই প্রধান। বাণীকে সুরের ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তোলা হয়। বাংলা গান এই ধারার অন্তর্গত। করুণাময় গোস্বামী মনে করেন, "বাংলা গান মূলত কাব্যগীতি।"[৮] সুতরাং গানের শ্রেণীকরণে কাব্যগীতি কোন শিরোনাম হতে পারে না।

নজরুলের গানের শ্রেণীকরণে সংকলকগণ যদিও বিষয়ভিত্তিক এবং রাগভিত্তিক এই দুই পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন; তবে তাঁর পূর্ববর্তী সংগীত রচয়িতা যেমন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ নজরুল ছাড়া বাকী এই চারজন এবং উনবিংশ শতকের অন্যান্য সকল সংকলন গ্রন্থে বিশুদ্ধ বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতবিতানে তাঁর গানসমূহকে পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক এই কয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। পূজা পর্যায়ের গানসমূহকে আবার উপবিভাগে ভাগ করেছেন। যেমন-গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, সাধনা ও সংকল্প, দুঃখ ও আশ্বাস, অন্তমুখ, আত্মবোধন, জাগরণ, নিঃসংশয়, সাধক, উৎসব, আনন্দ, বিশ্ব, বিবিধ, সুন্দর, বাউল, পথ, শেষ, পরিণয়। প্রেম পর্যায়ের গানে দু'টি উপবিভাগঃ গান, প্রেম বৈচিত্র্য। প্রকৃতি পর্যায়ের গান সমূহকে সাধারণভাবে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত প্রভৃতি উপবিভাগে ভাগ করেছেন।[৯] দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের শ্রেণীকরণে বিশুদ্ধ বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণকেই গ্রহণ করেছেন। সাংগীতিক শ্রেণীকরণের ধার কাছ দিয়েও তিনি যাননি। যে কারণে তাঁর পরবর্তী সংকলগণ তাঁর গানের শ্রেণীকরণে বিশুদ্ধ বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণেই অধিকতর আগ্রহী হয়েছেণ। বাংলা গানের

Dhaka University Institutional Repository

অন্য তিনজন উল্লেখযোগ্য সংগীত রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের ক্ষেত্রেও একই দিক প্রতিফলিত। রথীন্দ্রনাথ রায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) আর্যগাথা প্রথম ভাগের গানগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন: ১। প্রকৃতিবিষয়ক, ২। ঈশ্বরবিষয়ক, ৩। বেদনানুভূতি মূলক, ৪। দেশাত্মবোধক[১০]।

রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫-১৯১০) সঙ্গীত রচনাকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। স্বদেশী গান, হাসির গান ও ভক্তিগীতি। এছাড়া কিছু প্রেমের গানও তিনি লিখেছেন।[১১]

অতুলপ্রসাদ সেনের (১৮৭১-১৯৩৪) গানকে পাঁচটি শিরোনামে বিভক্ত করা হয়েছে। দেবতা, প্রকৃতি, স্বদেশ, মানব, বিবিধ।[১২]

নজরুল যেহেতু নিজেই তাঁর গানের শ্রেণীকরণ মিশ্র পদ্ধতিতে করে গেছেন, তাই পরবর্তীতে নজরুল সংগীতের সংকলন গ্রন্থে মিশ্র পদ্ধতি গ্রহণের প্রবণতা দেখা যায়।

নজরুল সংগীতসমূহকে বিষয়ভিত্তিক এবং রাগভিত্তিক এই দুইভাবে শ্রেণী বিন্যস্ত করা প্রয়োজন। বিষয়বস্তুগত শ্রেণীকরণ যেমন নজরুল সংগীতের বৈচিত্র্যপূর্ণ সাম্রাজ্যের সাথে পরিচয়ের পথ সুগম করবে, তেমনি সাংগীতিক শ্রেণীকরণ ছাড়া সুষ্ঠু গায়নরীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

বর্তমান গবেষণার সুবিধার্থে নজরুল সঙ্গীতের শ্রেণীকরণ করতে গিয়ে বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণকেই গ্রহণ করা হয়েছে। যেমনঃ

১. প্রেম বিষয়ক

২. প্রকৃতি বিষয়ক সঙ্গীত

৩. ধর্মীয় সঙ্গীত

৪. দেশাত্মবোধক সঙ্গীত

৫. হাসির গান

৬. বিবিধ গান

Dhaka University Institutional Repository

প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত

নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে সমধিক পরিচিত। তাঁর বিদ্রোহী সত্ত্বার পিছনে আর একটি সত্ত্বা লুক্কায়িত। সেটি তাঁর প্রেমিক সত্ত্বা। কবি নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী/আর হাতে রণতূর্য'।[১৩] বিদ্রোহী ও প্রেমিক সত্ত্বার এই দ্বৈত সহাবস্থান বাংলা সাহিত্যের অন্য কোন কবির কবিতায় পাওয়া যায় না। বিদ্রোহী কবি হিসেবে খ্যাতির পিছনে যেমন তাঁর দেশপ্রেম কাজ করেছে তেমনি মানব জীবনের বিচিত্র দিক প্রকাশেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কবিতার ক্ষেত্রে তিনি সমাজসচেতন কবি হিসেবে দেশাত্মবোধক কবিতা লিখে সমাজমানসে তীব্রভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ প্রেম-বিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতারূপে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। বলা চলে প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতা হিসেবেই তিনি সর্বাধিক পরিচিতি পেয়েছেন।

প্রেমের গানে মূলত দেহকেন্দ্রিক প্রেমে বিরহ, ব্যথা, অভিমান হতাশা না পাওয়ার বেদনা এগুলোই প্রধানত গানের উপজীব্য বিষয়। কবি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন আবেগিক। একই সাথে প্রেম বিরহ, পাওয়া- না পাওয়া, বন্ধন-মুক্তি তার জীবনে দেখা যায়। প্রেমের গানে সত্য এই অনুভূতিগুলির প্রকাশ ঘটেছে। কবির প্রেমভাবনা একান্তই মানবিক এবং মর্তচারী।

নজরুলের প্রেমের গানকে দুই ভাগে ভাগ করা চলে। একটি হচ্ছে সাধারণ মানব প্রেমের গান, অন্যটি গজল অঙ্গের গান। সাধারণ প্রেমের গানে তাঁর বিরহদীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। বিরহের গানে তাঁর কৃতিত্ব বেশী।

১। গানগুলি মোর আহত পাখির সম

২। হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে

৩। যাও তুমি ফিরে এই মুছিনু আখি

৪। কেন কাঁদে পরাণ কী বেদনায় কারে কহি।

৫। শুন্য এ বুকে পাখি মোর আয় ফিরে আয় ফিরে আয়

৬। পাষাণের ভাঙলে ঘুম কে তুমি সোনার ছোঁওয়ায়

৭। ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি।

দ্বিজেন্দ্রলালের (১৮৬৩-১৯১৩) সাথে নজরুলের প্রেমের গানের মিল রয়েছে। উভয়েরই প্রেমভাবনা মর্তচারী। সুদূরের অভিসারে কেউই আগ্রহী ছিলেন না। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত এঁদের গান তুচ্ছাতিতুচ্ছ বাস্তবতাকে অতিক্রম করে অতিন্দ্রীয় লোকে বিচরণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা গানে গজল গানের ধারা সৃষ্টি নজরুলের অসামান্য কৃতিত্ব। গজল ফারসী শব্দ। এর মূলভাব বিষয় হল প্রেম। গজল প্রেম সঙ্গীতের অন্তর্গত। বাংলা গান নিয়ে নজরুল বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। গজল ঢঙের গান প্রবর্তন এগুলোর মধ্যে একটি। তার পূর্বে অতুলপ্রসাদ সর্বপ্রথম বাংলায় গজল লেখেন। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গজল হচ্ছে 'ভাঙা দেউলে মোর কে আইলে আলো হাতে,' 'রাতারাতি করল কে রে বাগান ফাঁকা', 'কে গো তুমি বিরহিনী আমারে সম্ভাষিলে' ইত্যাদি। কিন্তু এসকল গানে বাংলা গানের সুরটি সার্থকভাবে ফুটে ওঠেনি। হিন্দুস্থানী সুরের ঢং থাকায় অতুলপ্রসাদের গান বাঙালী সমাজে জনপ্রিয় হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলালও গজল রচনা করেছেন। কিন্তু নজরুলই বাংলা গানের ধারায় গজল গানের সার্থক স্রষ্টা। পারস্য গজলের সুরকে বাংলা গানের আবহে সার্থকভাবে রূপ দিয়েছেন তিনি।

ইরানী গজল সাধারণ মানব-মানবীর প্রেমের গান নয়। এটি ঈশ্বর প্রেমের গান। গজলে সাধারণ লৌকিক জগতের প্রেম-লীলা যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে তা এর মূল বক্তব্য নয়। নর-নারীর প্রেম এখানে রূপক মাত্র। এর অন্তর্নিহিত অর্থ ঈশ্বরের প্রতি প্রেম। এদিক দিয়ে গজল গান বৈষ্ণব পদাবলীর সমগোত্রীয়।[১৪]

তবে হিন্দুস্থানী বা উর্দু গজলে ইরানী গজলের এই রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। হিন্দুস্থানী বা উর্দু গজলের মূল বক্তব্য সাধারণ মানব-মানবীর প্রেম। এই প্রেম কোন গূঢ় রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়নি। নজরুলের গজল অঙ্গের গানও উর্দু গজল অনুসরণে রচিত।[১৫]

১৯২৬ সালের শেষ দিক থেকে নজরুল গজল রচনা শুরু করেন।[১৬] 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল' গানটিকে নজরুলের প্রথম গজল বলে মনে করা হয়। গানটি ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ বাংলা, ১৯২৬ সনে কৃষ্ণনগরে রচিত ও ১৩৩৩ মাঘের কল্লোলে প্রকাশিত হয়।[১৭] ১৯২৬ সাল থেকে গ্রামোফোন কোম্পানীতে যোগ দেওয়ার পূর্ব-পর্যন্ত সময়ে তিনি অজস্র গজল রচনা করেন।

নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন ১৯২৮ সালে।[১৮] গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরই নজরুলের গজল রচনায় ভাঁটা পড়ে। সেখানে তিনি কোম্পানীর চাহিদা মতো ফরমায়েস অনুযায়ী গান রচনা করতে থাকেন এসময় আধুনিক গান রচনা করায় তাঁর মনোযোগ বেশী দেখা যায়। বিভিন্ন রাগ-রাগিনী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ফলে গজল রচনার যে একটি নূতন ধারা বাংলা গানে সংযোজিত হয়েছিল তার যথার্থ বিকাশ এ পর্যায়ে এসে অনেকটা স্তিমিত হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতি বিষয়ক সঙ্গীত

ষড় ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। ঋতুচক্রের আবর্তন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে যেমন বৈচিত্র্য এনেছে. তেমনি শিল্প-সাহিত্যেও এর প্রভাব পড়েছে। আদিকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সকল বাঙালী কবির রচনায়ই ঋতুভিত্তিক বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাচীন কবি কালিদাসের 'ঋতুসংহার' সংস্কৃত ভাষায় লেখা হলেও এখনও বাঙালী পাঠকের কাছে অতি প্রিয় এবং উপভোগ্য।[১৯] আর বর্তমান কালের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো প্রকৃতি বিষয়ক অজস্র গান লিখেছেন। তাঁর বর্ষা বিষয়ক গানের সংখ্যাই বেশী। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক নজরুলের ঋতুবিষয়ক গান সংখ্যায় খুব বেশী না হলেও কিছুতেই নগণ্যও বলা যাবে না।

নজরুলের প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক গানকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা কঠিন কাজ। তাঁর প্রকৃতিকে নিয়ে লেখা সব গানকেই প্রকৃতি বিষয়ক গান বলে অভিহিত করা যায়। অনেক গানে প্রকৃতি এসেছে মানবিক অনুভূতি প্রকাশের সহায়করূপে। যেমন, বর্ষাকে নিয়ে লেখা অনেক গানের উদ্দেশ্য প্রেমিক হৃদয়ের বিরহকে ফুটিয়ে তোলা। সেক্ষেত্রে এই ধরণের গান প্রকৃতপক্ষে প্রেম বিষয়ক গান। রফিকুল ইসলামের মতে, প্রকৃতি বিষয়ক গানের মোট সংখ্যা তিনশত চারটি।[২০] এই তিন শত চারটি গান বিশুদ্ধ প্রকৃতি বিষয়ক গান নয়। নজরুলের বিশুদ্ধ প্রকৃতি বিষয়ক গান সংখ্যায় খুব অল্প। অধিকাংশ গানেই প্রেম ও প্রকৃতি একে অপরের অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে।

গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহ, খরা, বৈশাখী ঝড়, প্রকৃতির রুক্ষতা ইত্যাদি বিষয়াবলী গ্রীষ্ম বিষয়ক গানে এসেছে। 'এলো এলোরে বৈশাখী ঝড়',। তৃষিত আকাশ কাঁপেরে,' 'খর রৌদ্রের হোমানল জ্বালি তপ্ত গগনে জাগি' মেঘবিহীন খর বৈশাখে তৃষায় কাতর চাতকী ডাকে' তাঁর উল্লেখযোগ্য গান।

বাংলা সাহিত্যে বর্ষাকে নিয়ে সর্বাধিক গান রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ষা বিষয়ক গানের সংখ্যা অন্য ঋতুর তুলনায় বেশী। নজরুলের বেলায়ও তাই ঘটেছে। বর্ষায় প্রকৃতির স্নিগ্ধতা, আকাশে মেঘের ঘনঘটা, মেঘের গুরু গম্ভীর গর্জন, শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বর্ষণ ইত্যাদি বিচিত্র দৃশ্যাবলী তাঁর গানে এসেছে। বর্ষা বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গান হচ্ছে-

'কে দুরন্ত বাজাও ঝড়ের ব্যাকুল বাঁশি',
'এস হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া,'
'এল বরষা শ্যাম সরসা প্রিয় দরশা'
'মেঘের হিন্দোলা দেয় পূব হাওয়াতে দোলা'

শরৎ, হেমন্ত ঋতু ভিত্তিক গান সংখ্যায় খুব কম। শরৎ বিষয়ক উল্লেখযোগ্য একটি গান 'এস শারদ প্রাতের পথিক/এস শিউলি বিছানো পথে'। হেমন্ত কবিকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাই এই সম্পর্কিত গান বিরল। হেমন্তকে আহবান করে তিনি লিখেছেন-'হেমন্তিকা এস এস হিমেল শীতল বন তলে'। শীত ঋতু ভিত্তিক কোন গান নজরুলগীতিতে নেই। অন্যান্য ঋতুর ন্যায় বসন্তকে নিয়ে লেখা তাঁর গানের সংখ্যা অজস্র।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় সঙ্গীত

নজরুল ইসলাম বিপুল সংখ্যক ধর্মীয় সঙ্গীত লিখেছেন। ধর্মীয় সঙ্গীতগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। হিন্দু ধর্মীয় সঙ্গীত ও ইসলামী সঙ্গীত। ইসলামী গানের মধ্যে পড়ে হামদ, নাত, নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব যাকাত, ঈদ, মোহররম, আরব, মক্কা, মদীনা ইত্যাদি ইসলামী ঐতিহ্য সম্পর্কিত বিষয়াদি। করুণাময় গোস্বামীর মতে, নজরুলের ইসলামী গানের সংখ্যা দুই শতাধিক (২১) হিন্দু ধর্ম সঙ্গীতের মধ্যে পড়ে ঈশ্বর, দেব-দেবী, অবতার বা মহাপুরুষের প্রশংসামূলক গান। আবদুল আজীজ আল-আমানকৃত নজরুল গীতি অখন্ড' সংস্করণে হিন্দুধর্মীয় সঙ্গীতের সংখ্যা দেখানো হয়েছে ৫৪০। (২২)

নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানীতে যোগ দেন ১৯২৮ সালে। [২৩] তখন থেকেই তিনি ধর্মীয় সঙ্গীত রচনার দিকে ঝুঁকে পড়েন। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি অজস্র ধর্মীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন। শিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদের মতে, তাঁর বিশেষ অনুরোধে নজরুল ইসলামী গান লেখা শুরু করেন। নজরুলের প্রথম ইসলামী গানের রেকর্ড 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ' মুসলিম সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করলে তিনি উৎসাহিত হয়ে একের পর এক ইসলামী গান লিখে চলেন।[২৪] গ্রামোফোন কোম্পানী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হওয়ায় ব্যবসায়িক সাফল্যের কারণে একের পর এক নজরুলের লেখা ইসলামী গানের রেকর্ড বের হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আব্বাসউদ্দীনের অনুরোধে লেখা ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে গানটি নজরুলের লেখা প্রথম ইসলামী গান নয়। এটি তাঁর লেখা প্রথম রেকর্ডকৃত ইসলামী গান। রেকর্ড নং ছিল এন-৪১১১ প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী ১৯৩২, রেকর্ডের অপর পৃষ্ঠার ছিল তাঁরই লেখা ও সুর করা 'ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এল নবীন সওদাগর। [২৫] নজরুল রচিত প্রথম ইসলামী গান "বাজলো কিরে ভোরের সানাই নিদ মহলার আঁধার পুরে" গানটি মোয়াজ্জিন পত্রিকার ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যায়, কার্তিক ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে (অক্টোবর নভেম্বর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত হয়। এ গানটি শিল্পী মোহাম্মদ কাসেম এইচ. এম ভি রেকর্ডে গেয়েছেন। রেকর্ডের অপর পিঠে ছিল নজরুলের লেখা ও সুরারোপিত অপর একটি গান, যার প্রথম পংক্তি 'বক্ষে আমার কাবার ছবি চক্ষে মোহাম্মদ রসুল' । রেকর্ড নম্বর এন- ৭০০৫, প্রকাশকাল জুন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ।[২৬] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নজরুলের লেখা 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে' গানটি আব্বাসউদ্দীনের কন্ঠে পাওয়া রেকর্ডকৃত প্রথম ইসলামী গান এবং 'বাজলো কিরে ভোরের সানাই', গানটি কবি রচিত প্রথম ইসলামী গান। তবে নজরুলের ইসলামী গান রচনার হাতেখড়ি হয়েছিল তার আরও

Dhaka University Institutional Repository

অনেক পূর্বেই। তিনি বাল্যকালে লেটোর দলে থাকাকালীন সময়ে বেশ কিছু ইসলামী গান লিখেছিলেন। এগুলো অপরিণত হাতের লেখা হিসেবে নজরুল সঙ্গীতের তালিকায় স্থান না পেলেও বলা চলে তাঁর ইসলামী সঙ্গীত রচনার হাতেখড়ি হয়েছিল সেই ছেলেবেলাতেই।

শৈশবের পারিবারিক পরিমন্ডলটি তাঁর মধ্যে অধ্যাত্মচেতনার বীজ রোপণ করে। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে দারিদ্র্যের কারণে মাত্র দশ বৎসর বয়সে তিনি পাহলোয়ানের মাজারে খাদেম ও পীরপুকুর মসজিদে ইমামের কাজ নেন। কৈশোরেই তিনি পিতৃব্য বজলে করীমের প্রেরণায় আরবী, ফার্সী, উর্দু প্রভৃতি শব্দ মেশানো মিশ্র ভাষার এক প্রকার ইসলামী গান রচনা করতেন।[২৭] ১১/১২ বৎসর বয়সে লেটোর দলে যোগ দেন। লেটোর দলে থাকাকালীন তিনি শকুনীবধ, মেঘনাদবধ, রাজপুত্র, চাষার সঙ প্রভৃতি গীতি-নাট্য ও প্রহসন এবং অনেক মারফতী, পাঁচালী ও কবিগান লিখে খ্যাতি অর্জন করেন।[২৮] লেটোর দলের জন্য গান রচনা করতে গিয়ে তিনি হিন্দু ও মুসলিম এই উভয় ঐতিহ্য থেকে উপাদান নিয়ে গান লিখেছেন। তাঁর তখনকার রচনায় ঐ দুই ঐতিহ্যের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। তাঁর একটি লেটোগান উদ্ধৃত করা হলোঃ

চাষ ক'রো দেহ-জমিতে।
হবে নানা ফসল এতে।।
নামাজে জমি 'উগালে',
রোজাতে জমি 'সমালে',
কলেমায় জমিতে মই দিলে
চিন্তা কি হে এই ভবেতে।।
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাতে
বীজ ফেল তুই বিধি মতে,
পাবি 'ঈমান' ফসল তাতে
আর রহাব সুখেতে।
নয়টা নালা আছে তাহার
ওজুর পানি সিয়াত যাহার
ফল পাবি নানা প্রকার
ফসল জন্মিবে তাহাতে।।
যদি ভালো হয় হে জমি

Dhaka University Institutional Repository

হজ্ব জাকাত লাগাও তুমি
আরো সুখে থাকবে তুমি-
কয় নজরুল ইসলামেতে।।[২৯]

রাধা কৃষ্ণের কাহিনী নিয়ে পালা লিখেছেন ঃ

বুঝলাম নাথ এত দিনে
যুবকের ছলনা হে।
কোথা শিখিলে এ প্রণয়
আমারে বল না হে।।
তোমার হিয়া কঠিন অতি
জান না শ্যাম প্রেমের রীতি,
তাই নিভালে প্রেমের বাতি
আর বাতি জ্বেলনা হে।।
এই রূপে কত কামিনী
মজায়েছেন গুণমণি
কপাল দোষে বিরহিনী
তোমার আর হ'ল না হে।।
বিরহ জ্বালায় মরিলাম
আর জ্বালায়ো না বাঁকা শ্যাম
ভেবে বলে নজরুল ইসলাম,
মের না ললনা হে।।[৩০]

পরবর্তীকালে নজরুলের লেখায় হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্যের যে সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায় ধরে নেওয়া যায় তার সূচনা লেটোর দলে থাকাকালীন সময়েই হয়েছে।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ৭ই বা ৮ই মে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে নজরুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র বুলবুলের মৃত্যু হয় [৩১]। এই ঘটনায় তিনি এতটাই শোকাহত হয়েছিলেন যে এই শোক তাঁকে অতিমাত্রায় অধ্যাত্মমুখী করে তোলে। মানসিক শান্তি লাভের জন্য তিনি লালগোলা হাই স্কুলের হেডমাস্টার যোগী বরদাচরণ মজুমদারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আরও একটা কারণ তাঁর ব্যক্তি জীবনের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর স্ত্রী প্রমীলা দেবী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। নজরুল তাঁর চিকিৎসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। চরম আর্থিক অনটনের কারণে তিনি তাঁর সমস্ত বইয়ের স্বত্ত্ব ও রেকর্ডের রয়ালটি শ্রী অসিমকৃষ্ণ দত্তের নিকটে বন্ধক রেখে চার হাজার টাকা ধার নেন। পুত্র বুলবুলের মৃত্যু এবং স্ত্রীর অসুস্থতা তাকে মানসিকবাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। এই মানসিক বিপর্যয়ই তাঁকে ক্রমান্বয়ে অধ্যাত্মসাধনার দিকে নিয়ে যায়। অতিমাত্রায় অধ্যাত্মচেতনা হয়তো তাঁকে ধর্ম সঙ্গীত রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

নজরুলের শ্যামা সঙ্গীত রচনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে কাজী অনিরুদ্ধ বলেছেন, নিছক ব্যবসায়িক দিকই এই সব গান রচনার মূল উৎস নয়। উৎস আরো গভীরে। আসলে কবির মনই তখন ভক্তিপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। ১৯৩০ খ্রীষ্ট সনের মে মাসে আমার সর্বাগ্রজ 'বুলবুল' এর মৃত্যু হলো। তখন এই শিশুর বয়স তিন-চার বছরের বেশী নয়। পিতৃদেব এই শিশুকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। বুলবুলের একটি ছবি এখনও আমাদের বাড়িতে আছে। পিতৃদেব এই ছবিটির তলায় নিজের হাতে লিখে রেখেছিলেন: "উড়ে চলে গেছে বুলবুল, শূন্য এ স্বর্ণপিঞ্জর। " এই বুলবুলের মৃত্যু এবং অত:পর আমার মাতৃদেবীর স্বাস্থ্যহানি এই দুটি পারিবারিক ব্যাপার আমার পিতৃদেবকে অস্থির এবং পাগলপ্রায় করে তুলেছিল। তিনি শান্তি খুঁজছিলেন। যাঁরা আমাদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁরাই জানেন পিতৃদেবের এ্ সময়কার মানসিক অবস্থার কথা। [৩২]

রফিকুল ইসলামের মতে, "নজরুল প্রায় এক হাজার ধর্মীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে হিন্দু ঐতিহ্যের শ্যামা সঙ্গীত, ভজন, কীর্তন এবং ইসলামী ঐতিহ্যের হামদ, নাত, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, ঈদ, মর্সিয়া প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের গান। এসব গানের রচনা ত্রিশের দশকের শেষ অবধি চলতে থাকে এবং নজরুলের মৌলিক সঙ্গীত রচনার তৃতীয় পর্যায়ের সৃষ্টি ভক্তিমূলক ও ইসলামী গানের পর্ব"। [৩৩]

বাংলা গানে ইসলামী গানের একটি নতুন ধারা নজরুল সৃষ্টি করেছেন। নজরুলের পূর্বে সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী ইসলামী ঐতিহ্য নিয়ে অসংখ্য কবিতা,গান রচিত হয়েছে। মধ্যযুগের পুঁথি সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই ছিল আল্লাহ রসুলের নাম নিয়ে কাব্য শুরু করা।

দু'একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা হলোঃ

১) সর্বত্র খোদার নামে শুকুর হাজার।
যাহাতে উৎপত্তি হৈল সৃষ্টের প্রচার।
দয়ার সাগর সেহি মায়ার নিধান।
কে কহিতে পারে তাঁর মহিমা ব্যাখ্যান।
নবীর চরণ বন্দো করিয়া ভকতি।

Dhaka University Institutional Repository

যাহার চরণ বিনে অন্য নাহি গতি। [৩৪]

|জঙ্গনামা: হেয়াত মামুদ|

২। প্রথমে প্রণামি প্রভু অনাদি নিধান
নিমিষে সৃজিছে যেই এ চৌদ্দ ভুবন
আদি অন্ত নাহি তার নাহি স্থান স্থিত
খন্ডন বর্জিত রূপ সর্বত্রে ব্যাপিত। [৩৫]

|নবীবংশ, ১ম খন্ড: সৈয়দ সুলতান|

নজরুলের ইসলামী গান প্রচলিত ধারা থেকে ভিন্ন। তাঁর গান শুধুই স্রষ্টার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন অথবা রসুলের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রকাশ নয়। সে সাথে রয়েছে ইসলামের সুমহান ঐতিহ্য, অতীত ঐতিহাসের গৌরবময় কাহিনী। অতীত ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুসলিম জাতিকে বর্তমান দুরবস্থা কাটাতে নববলে বলীয়ান হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

নজরুল শুধু বিষয়বস্তুর প্রকাশেই নতুনত্ব আনেননি শব্দ চয়ন ও তার প্রয়োগেও তিনি সার্থক। তাঁর ইসলামী গানে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আব্দুস সাত্তার তাঁর, 'নজরুল কাব্যে আরবী-ফারসি শব্দ' গ্রন্থে বলেছেন, সমগ্র নজরুল সাহিত্যে ব্যবহৃত আরবী-ফারসী-উর্দু বা অন্যান্য শব্দের সংখ্যা তিন হাজার। এর মধ্যে শতকরা ৬০% ভাগ আরবী শতকরা ৩০% ভাগ ফারসী শব্দ এবং শতকরা ১০% ভাগ উর্দু বা অন্যান্য শব্দ। [৩৬] এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলঃ

১। আমি যদি আরব (আ) হতাম মদিনারই (আ) পথ
এই পথে মোর চলে যেতেন নূর (আ) নবী হযরত (আ)

|গীতিশতদল|

২। রোজ (ফা) হাশরে (আ) আল্লা (আ) আমায় করোনা বিচার

|জুলফিকার: ২য় খন্ড|

৩। ওরে গুলাব! (ফা) নিরিবিলি নবীর কদম (ফা) ছুঁয়েছিলি

|বনগীতি|

৪। আয় মরুপারের হাওয়া, (আ) নিয়ে যারে মদিনায় (আ)
জাক পাক (ফা) মোস্তফার (আ) রওজা (আ) মোবারক (আ) যেথায়

|জুলফিকার|

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের পুথি রচয়িতারাও কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দ প্রচুর ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ভাব অনুযায়ী ভাষার প্রয়োগ সবক্ষেত্রে সার্থক হননি। ফকির গরীবুল্লাহ্‌র দোভাষী পুঁথির উদাহরণ দেওয়া হলোঃ

রোজরচে (ফা) মেহের (আ) কহে আমির (আ) হুজুরে (আ)
মহিমে (আ) যাইবে আজি এস মেরা ডেরে (হি)
আজি রাত দুজনে করিব গোজরান (আ)
মহিমে যাইবে কালি হইলে বেহাম (ফা)
শুনিয়া আমির (আ) চলে গেল তাঁর ডেরে (হি/উ.)
খেলায় বেহুশ (ফা) দারু আমির হামজারে (আ)। [৩৭]

নজরুল তাঁর লেখায় বিদেশী শব্দ অবলীলায় ব্যবহার করেছেন। অনেক স্থানে ছন্দের প্রয়োজনে কিছুটা পরিবর্তন করেও প্রয়োগ করেছেন। এতে করে শব্দের অর্থ বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। আবদুস সাত্তার মধ্যযুগের কবিদের সাথে নজরুলের তুলনা করে বলেছেন, মধ্য- যুগের কবিদের শব্দ ব্যবহারে সুঘ্রান থাকলেও বসরার গোলাপের সুঘ্রান ছিল না। নজরুলের শব্দ ব্যবহারে ছিল বসরার গোলাপের সুঘ্রান।[৩৮] ভাব, ভাষা, প্রকাশ ভঙ্গি ইত্যাদি সবদিক থেকেই নজরুলের ইসলামী সঙ্গীত তাঁর পূর্ববর্তী গানের ধারা থেকে পৃথক।

হিন্দু ধর্ম সঙ্গীত পর্যায়ে নজরুলের গানের সংখ্যা যেমন অজস্র, বিষয় বৈচিত্র্যেও তা অতুলনীয়। এদেশে হিন্দু ধর্ম সঙ্গীতের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী দেব-দেবীর স্তুতি গান বা ভজন বহুল প্রচলিত ছিল। হিন্দু ধর্ম সঙ্গীতের উদ্ভব, বিকাশ প্রসঙ্গে সুকুমার রায় বাংলা সঙ্গীতের রূপ গ্রন্থে বলেছেন, "মধ্যযুগে উত্তর ভারতময় নানান ধর্মীয় ভাবের প্লাবন এসেছিল। একটির পর একটি ধর্মীয় ভাবকে অবলম্বন করে মধ্যযুগীয় মিষ্টিক বা মরমীয়া সাধুসন্তরা নানান গীত রচনা করে আত্মোপলব্ধির কথা প্রচার করেছেন। উত্তর ভারতময় ভজনাবলী সৃষ্টির মূল কারণই এইরূপ। মিষ্টিকদের মতবাদ ভজন, দোহা প্রভৃতিতে রূপলাভ করে এবং নানান সুর ছন্দে প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যযুগকে ভারতের পাঠান রাজত্বের শুরু থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সময়কাল ধরে নিতে পারি। হিন্দুস্থানী সংগীতে এই সময়কালের মধ্যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে গেছে। বাংলাদেশে তখন কীর্তনের প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে। উৎকলে এই সময়ে 'ওডিশী', 'চম্পূ',

Dhaka University Institutional Repository

জগন্নাথদেবের উপাসনার "জনান এবং ছান্দ" প্রচলিত হয়েছে। অসমীয়া সংগীতে তখন "বরগীত" এবং "অঙ্কিয়ানাটের" চর্চা চলেছে। এই সময়কালের মধ্যেই বাউল সঙ্গীতের উৎপত্তি ও বিবর্তন।[৩৯]

বৈষ্ণব পদাবলীর সমসাময়িককালে শাক্ত পদাবলী বিকাশ লাভ করে। শাক্ত ধর্মমত থেকে শাক্ত সঙ্গীতের উৎপত্তি। মধ্যযুগের শাক্তসঙ্গীত অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামপ্রসাদের হাতে নবরূপ পায়। রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীতের বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যা করে আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন "মধ্যযুগের বাংলার সে সামাজিক পরিবেশ হইতে বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালীর সমাজ জীবনে অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিল না। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীতে আসিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা এবং শাক্ত সাহিত্যের ধারা উভয়ই শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, ইহাদের প্রবাহ উনবিংশ শতাব্দীর ভিতর দিয়া অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইবার মত ইহাদের আর কোন শক্তি ছিল না। [৪০] অষ্টাদশ শতকে শাক্ত সঙ্গীতের শুষ্ক ধারা রামপ্রসাদের (১৭২৩-৭৫) হাতে প্রাণ ফিরে পায়। রামপ্রসাদের গানের সংখ্যা কত এ সম্পর্কে কোন কিছুই বলা যায় না। তাঁর একটি গানে আছে 'লাখ উকিল করেছি খাড়া'। একজন মানুষের পক্ষে লক্ষ গান রচনা করা সম্ভব নয়। এ পর্যন্ত অনধিক আড়াই শত গান সংগৃহীত হয়েছে।[৪১] তাঁর গানের ভাষা সহজ, সরল কিন্তু ভাবের গভীরতা অসাধারণ।

রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতের বিপুল জনপ্রিয়তার পিছনে সমসাময়িক সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ছিল বৃটিশ শাসন শোষণে নিষ্পেষিত। সমাজের সবক্ষেত্রে যখন অবক্ষয় চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত সর্বস্তরের জনগণের কাছে মুক্তির সন্ধান দিয়েছে। শক্তি গীতির কালী দেবী আবির্ভূত হয়েছেন যুগমাতা রূপে।[৪২] নজরুল এ ধারাকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন।

নজরুল কালীসাধক রামপ্রসাদ সেন প্রবর্তিত শাক্ত সঙ্গীতের ধারায় উল্লেখযোগ্য গীতিকার। শক্তিদেবী কালী বা শ্যামার মাহাত্ম্য বর্ণনা শ্যামাসঙ্গীতের বর্ণনীয় বিষয়। কিছু শ্যামাসঙ্গীতে কালীর মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। যেমন-

১। মাতৃ নামের হোমের শিখা

২। শ্যামা নামের ভেলায় চড়ে

৩। মহাকালের কোলে এসে

৪। কে বলে মোর মাকে কালো

৫। বল রে জবা বল।

Dhaka University Institutional Repository

অপর কিছু গানে কালীর রৌদ্রী রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। কালীর রৌদ্রী রূপ তাঁকে সমাজের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে সাহস যোগায়। এসকল গানে বিধৃত পৌরাণিক বিষয়াবলী প্রকারান্তরে তাঁর সমাজভাবনাকে রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করছে। শ্যামাসঙ্গীত বিষয়ক গানের আলোচনায় করুণাময় গোস্বামী মন্তব্য করেছেন, " মহাশক্তিময়ী, রণরঙ্গিণী, অসুরনাশিনী, নৃমুন্ডমালিনী, দিগবসনা কালীর চরাচর স্তম্ভিত করা রৌদ্রী রূপের আশ্চর্য বর্ণনা উপস্থাপিত করেছেন নজরুল এসব গানে। অসুরনাশিনী কালীর পৌরাণিক আখ্যানের ভেতর দিয়ে পরমাশক্তির যে দৃপ্ত প্রকাশ তা বিদ্রোহী কবিকে অনুপ্রাণিত করা স্বাভাবিক।" [৪৩]

নজরুল কালীকে রণরঙ্গিণী বেশে আহ্বান করে প্রকারান্তরে দেশ ও জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করেছেন । কালীর রণ-রঙ্গিণী রূপ প্রত্যাশা করেছেন এমন কিছু গানের উল্লেখ করা হলোঃ

১। জাগো শ্যামা জাগো শ্যামা
আবার রণ-চন্ডী সাজে
তুই যদি না জাগিল মা গো
ছেলেরা তোর জাগবে না যে [৪৪]

২। মাতল গগন অঙ্গনে ঐ
আমার রণ-রঙ্গিণী মা।
সেই মাতনে উঠ্‌ল দুলে
ভুলোক দ্যুলোক গগন-সীমা।। [৪৫]

৩। নাচে রে মোর কালো মেয়ে
নৃত্য কালি শ্যামা নাচে।
নাচ হেরে তোর নটরাজও
পড়ে আছে পায়ের কাছে।।
নাচ হেরে তোঁর নটরাজও
পড়ে আছে পায়ের কাছে। [৪৬]

রামপ্রসাদের গানে মা ছেলের আত্মিক সম্পর্কের যে মধুরতা তা নজরুলের গানে পুরোপুরি রয়েছে। তবে নজরুলের গান ভক্তিভাব ছাড়িয়েও অতিরিক্ত একটি আবেদন শ্রোতার মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছে। এটি তাঁর সমাজসচেতন বক্তব্য। রামপ্রসাদের গানে ভক্তি ভাবের অতিরিক্ত সমাজভাবনার ইঙ্গিত রয়েছে। নজরুলের গানে শ্যামাকে রুপক হিসেবে ব্যবহার করে স্পষ্টভাবেই সমাজচিন্তার প্রকাশ হয়েছে। নজরুলের এধরণের গান দেশাত্মবোধক চেতনা প্রকাশে উজ্জ্বল।

শ্যামাকে নিয়ে যেমন নজরুল গান লিখেছেন তেমনি দেবী দুর্গাকে নিয়েও গান লিখেছেন। শ্যামাসঙ্গীতের মত দুর্গাসঙ্গীতকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর গান দুর্গার মহিমা, রূপবর্ণনা ইত্যাদি অথাৎ দুর্গাবন্দনামূলক। অপর শ্রেণীর গান দেশাত্মবোধক চেতনাসমৃদ্ধ।

দেবীস্তুতির মাধ্যমে উদ্দীপনামূলক চেতনাসমৃদ্ধ গান হচ্ছেঃ

১। নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে

২। খড়ের প্রতিমা পূজিস তোরা।

উমারূপিনী দুর্গাকে নিয়ে লেখা গান আগমনী গান নামে খ্যাত। পূজা নিতে দেবী দুর্গার মর্তে আগমনকে কৈলাস পর্বতে স্বামী শিবের গৃহ থেকে পিতা হিমালয়ের গৃহে কন্যা উমার আগমন হিসেবে মনে করা হয়। আগমনী গান উমার আগমন বিষয়ক গান। এই গানে উমার আগমনকে কোন সাধারণ গৃহস্থ ঘরে বিবাহিতা কন্যার পিতৃ গৃহে আগমনের সাথে তুলনা করা চলে। কোন ঐশ্বরিক ভাব এখানে নেই। কন্যার জন্য মায়ের উৎকণ্ঠা কন্যার আগমনে মায়ের আনন্দ প্রকাশ ইত্যাদি বিষয় এ গানের বর্ণনীয় বিষয়। আগমনী গান বাৎসল্য রসের গান। তবে দু একটি গানে সামাজিক বক্তব্য রয়েছে। কবির প্রত্যাশা দুর্গা তাঁর মহাশক্তি নিয়ে আবির্ভূত হবেন। তাঁর আগমন সমাজে বিদ্যমান ছুঁৎমার্গ, উচ্চ নীচের ভেদাভেদের অবসান ঘটাবে।

কবির ভাষ্যঃ

এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন
নিত্যা হয়ে রইবি ঘরে, হবে না তোঁর বিসর্জন"

--- --- ---

সেথা রইবে না কোন ছোঁয়াছুঁয়ি উচ্চ নীচের ভেদ
সবাই মিলে উচ্চারিব মাতৃনামের বেদ।

মোরা এক জননীর সন্তান সব জানি,
ভাঙবো দেয়াল, ভুলবো হানাহানি;
দীন-দরিদ্র রইবে না কেউ, সমান হবে সর্বজন।
বিশ্ব হবে মহাভারত,নিত্য প্রেমের বৃন্দাবন।[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

ভাগ্য দেবী লক্ষ্মীর কাছে কবি অভাব-অনটন দূর করার প্রার্থনা করেন। সাধারণ মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এধরণের গান সৃষ্টি হয়েছে। কবির সমাজসচেতন চিন্তা-চেতনা লক্ষ্মীকে নিয়ে লেখা গানে স্পষ্ট হয়ে ধরা পরেছে।

১। লক্ষ্মী মাগো এস ঘরে
সোনার ঝাঁপি লয়ে করে। [৪৮]

২। লক্ষ্মী মা তুই আয় গো উঠে
সাগর জলে সিনান করি। [৪৯]

বিদ্যাদেবী সরস্বতীকে নিয়ে গান লিখেছেন। যেমন-

১। কেন আমার আনলি মাগো

২। জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী

৩। জয় মর্তের অমৃতবাদিনী

৪। নমস্তে বীণা পুস্তক হস্তে

"জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী" গানটিতে শুধু মাত্র দেবীর কাছে বিদ্যা প্রার্থনাই করেন নি, বর্তমান দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে দেবীর হাতের রুদ্র বীণার ঝঙ্কারে জাতির জাগরণ প্রত্যাশা করছেন। নজরুলের শিব বিষয়ক কিছু গানও হিন্দু ধর্ম সঙ্গীতের অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য রচনা। কিছু শিব বিষয়ক গান ভক্তিমূলক। শিবের ধ্যানমগ্ন রূপের ছবি রয়েছে এসব গানে। যেমন-

১। সাজিয়াছ যোগী বল কার লাগি

২। অরুণ কান্তি কে গো যোগী ভিখারী

৩। ভিখারীর সাজে কে এলে

শিবের এই ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর রূপ বিদ্রোহী কবিকে সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দেয়। অপর কিছু গানে শিবের প্রলয়ঙ্করী রুদ্র মূর্তিকে প্রলয় বা ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। নজরুল বিদ্রোহী কবি। তাঁর এই বিদ্রোহ পুরাতনকে ভেঙ্গে নতুন সৃষ্টির পক্ষে। শিবের রুদ্র রূপ প্রকাশক গানগুলি নতুন সমাজ গড়ার ইঙ্গিত দেয়, দেশবাসীকে পরাধীনতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি যোগায়। এ ধরনের কিছু গানের উদাহরণ দেওয়া হলোঃ

১। সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ

২। নমো নমো নমো নম: হে নটনাথ

৩। গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু

৪। এস শঙ্কর ক্রোধাগ্নি

Dhaka University Institutional Repository

দেশাত্মবোধক সঙ্গীত

কাজী নজরুল ইসলামের সৈনিক জীবনের পরিধি ১৯১৭ সালের শেষ দিক থেকে ১৯১৯ সালের মাঝামাঝি। সৈনিক জীবন শেষে ১৯২০ সালে তিনি সাহিত্য সাধনায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। সে সাথে বাংলা গানের জগতেও তাঁর পদার্পণ ঘটে। নজরুল যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বেই এক অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজমান। স্বাভাবিক কারণেই সমাজসচেতন গীতিকার হিসেবে ওই সময় তিনি অসংখ্য স্বদেশী গান লেখেন। ১৯২০ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সময়কালকে তাঁর দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনার কাল বলা যায়। ১৯২৬ সালের পর তিনি গজল রচনার দিকে ঝুঁকে পড়েন।

নজরুলের দেশাত্মবোধক গীতমালাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়

১। দেশবন্দনামূলক গান

২। সমাজ বিষয়ক গানঃ-

(ক) নারী জাগরণমূলক গান

(খ) সাম্প্রাদায়িকতা বিরোধী গান

(গ) মুসলিম জাগরণমূলক গান

(ঘ) শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান

৩। রাজনীতি বিষয়ক গানঃ-

ক. পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান

খ. ব্যঙ্গাত্মক গান

১। **দেশবন্দনামূলক গানঃ** মাতৃভূমির প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার প্রকাশ এই শ্রেণীর গানের বৈশিষ্ট্য। দেশের পূর্ব গৌরব, অতীত ঐতিহ্য তুলে ধরা, নিসর্গ শোভার বর্ণনা, বর্তমান দুরবস্থায় অনুতপ্ত হওয়া, জন্মভূমিকে মাতৃরূপে কল্পনা করে মাতৃমহিমা কীর্তন করা, মাতৃঋণ স্বীকার করা ইত্যাদি বিষয় দেশবন্দনামূলক গানের উপজীব্য। দেশের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা প্রাকাশ পেয়েছে নজরুলের কতিপয় গানে। এসকল গান যুগের সীমাকে অতিক্রম করে চিরকালীন দেশবন্দনামূলক গানের মর্যাদা পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন-

১। আমার দেশের মাটি

২। আমার শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা আয়রে আয়

৩। একি অপরূপ রূপে মা তোমায়

৪। এস মা ভারত জননী

৫। গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ঐ

৬। জননী মোর জন্মভূমি

৭। ত্রিংশ কোটি তব সন্তান

৮। লক্ষ্মী মা তুই আয় গো ফিরে

৯। ভারত লক্ষ্মী মা আয়

সমাজ বিষয়ক গানঃ নজরুল আজীবন বাঙালী জাতীর পরাধীনতা মোচন, দুরবস্থা ঘোচাতে সাংগ্রাম করে গেছেন। অসাম্প্রদায়িক সমাজ নির্মাণ, মেহনতী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর স্বপ্ন। তিনি নারী মুক্তির লক্ষ্যে নারী জাগরণমূলক গান লিখেছেন; তেমনি মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা দূর করতে মুসলিম জাগরণমূলক ইসলামী গান লিখেছেন। নজরুলের সমাজ বিষয়ক গানকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা যায়ঃ

ক. নারী জাগরণমূলক গানঃ

পুরুষ শাসিত সমাজে নারী চিরকালই লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়ে এসেছে। নারীর অধিকার, নারীর স্বতন্ত্র সত্ত্বার স্বীকৃতি এই সমাজ প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ অবধি দিতে নারাজ ছিল। যে কারণে প্রাচীন, মধ্যযুগের সাহিত্যে দেখি নারীরা চিত্রিত হয়েছেন দেবীরূপে। নারীকে মানবীরূপে চিত্রিত না করে প্রকারান্তরে তাঁর মানবিক অধিকারকেই ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। নারীর স্বাতন্ত্র্য, অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় আধুনিক যুগে। উনিশ শতকে রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) সতীদাহ নিবারণ, বিদ্যাসাগরের (১৮২৪-১৮৯১) বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ইত্যাদির কার্যকারণ সংঘাতে সাহিত্যে নারীর পৃথক মানবিক সত্ত্বা স্বীকৃত হয়। এরপর মধুসূদন, বঙ্কিম এঁরা নারী স্বাধীনতার পক্ষে যে প্রাথমিক প্রয়াস নেন তাঁর চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের লেখনীতে। [৫০]

Dhaka University Institutional Repository

আর নজরুল সম্পর্কে বলা যায় নারীজাগরণের স্বপক্ষে তিনি এতটাই সোচ্চার ছিলেন যে, নারী পুরুষের সম অধিকার তাঁর পূর্বে আর কেউ এতটা বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেননি;

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণ কর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।

তাঁর নারী জাগরণমূলক গানের সংখ্যা যদিও অল্প; তবে এ সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ গানটি তাঁর রচনা। গানটি হচ্ছে 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা', এছাড়া 'আমি মহাভারতের শক্তি নারী', 'মেলি শত দিকে শত লেলিহান রসনা', 'চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা', 'নূরজাহান! নূরজাহান! সিন্ধু নদীতে ভেসে' ইত্যাদি গান উল্লেখযোগ্য।

খ. **সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গানঃ** সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গানের ধারায় প্রথম উল্লেখযোগ্য গান হচ্ছে হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশাত্মবোধক গান 'মিলে সবে ভারত সন্তান একতান মনপ্রাণ' (১৮৬৮) [৫১] এতে ভারতবর্ষের আপামর জনগণের প্রতি পারস্পরিক মিলনের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে রচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার মাটি বাংলার জল', অতুলপ্রসাদের লেখা 'দেখ মা এবার দুয়ার খুলে/গলে গলে এনু মা তোর/ হিন্দু মুসলমান দু ছেলে' প্রভৃতি গানে সাম্প্রদায়িক ঐক্য কামনা করা হয়েছে।

সাম্প্রাদায়িকতা বিরোধী গানের ধারায় সবচেয়ে বেশী আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছে নজরুলের গান। হিন্দু সমাজে প্রচলিত বর্ণভেদ প্রথাকে আঘাত করে নজরুল লিখেছেন 'জাতের নামে বজ্জাতি', 'আজ ভারত ভাগ্যবিধাতার বুকে', ঐ তেত্রিশ কোটি দেবতাকে তোর তেত্রিশ কোটি ভূতে' প্রভৃতি গান। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে লেখা 'কান্ডারী হুঁশিয়ার' শীর্ষক গানে নজরুল দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন,

"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কান্ডারী!বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।

'সুর-সাকী'র কয়েকটি গানে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের একটি গান বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। গানটি হচ্ছে-

Dhaka University Institutional Repository

মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।

মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।।

অপর একটি গান-

'গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী ঐ'

-এখানে হিন্দু-মুসলিম পূর্ব গৌরবের কথা একই গানে এসেছে। নজরুলের লেখায় হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের সে সহাবস্থান দেখা যায় এ গানটি তার উদাহরণ।

গ) **মুসলিম জাগরণমূলক গানঃ**

নজরুল মুসলিম সমাজের জন্য উদ্দীপনামূলক কিছু গান লিখেছেন। নজরুলের পূর্বে এ ধরণের গান কেউ রচনা করেননি। মুসিলম জাগরণমূলক গান রচনা করে নজরুল বাংলা গানের ক্ষেত্রে একটি নূতন ধারা সৃষ্টি করেছেন। মুসলমান সমাজকে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল দিনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে অলস সময় না কাটিয়ে বর্তমানের কঠিন বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে নব চেতনায় বলীয়ান হওয়ার আহ্বান করেছেন। এধরনের কয়েকটি গান হচ্ছে-

১। দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল

২। কোথায় তখত তাউস, কোথায় সে বাদশাহী

৩। জাগে না সে জোস লয়ে আর সে মুসলমান

৪। ভুবনজয়ী তোরা কি হায় সেই মুসলমান

৫। ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি

৬। বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান

৭। আল্লাহ্ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়

৮। তওফিক দাও খোদা ইসলামে।

বাণী ও সুরের কারুকার্যে মুসলিম জাগরণমূলক গানগুলি বাংলা দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামূলক গানঃ

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষনের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন জোড়দার হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর (১৯১৪-১৯১৮) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব সর্বহারা শ্রেণীর জাগরণকে ত্বরান্বিত করে। নজরুল আজীবন শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর চিন্তাধারার প্রকাশ আমরা দেখি তাঁর 'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধে।

"জাগো জনশক্তি! হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে-মজুর ভাইরা! তোমার হাতের এ লাঙল আজ বলরাম স্কন্ধে হলের মত ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক- উলটে ফেলুক! আন তোমার হাতুড়ি ভাঙ, ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ- ধুলায় লুটাও অর্থ-পিশাচ বল-দর্পীর শির"। [৫২]

তাঁর সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রকাশ কিছু গানে পাই। যেমনঃ-

১।	ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর কষে লাঙল	(কৃষাণের গান)
২। ওরে	ধ্বংস-পথের যাত্রী দল!	
	ধর হাতুড়ি তোল কাধে শাবল।।	(শ্রমিকের গান)
৩। আমরা	নীচে পড়ে রইব না আর	
	শোনরে ও ভাই জেলে,	(ধীবরদের গান)
৪। ওড়াও ওড়াও লাল নিশান!		(রক্ত পতাকার গান)
৫। ওরে ও শ্রমিক সব মহিমার উত্তর-অধিকারি		(জাগর তুর্য)
৬। জাগো	অনশনবন্দী, ওঠরে যত	(অন্তর-ন্যাশনাল সংগীত)

নজরুলের এ সকল গান বাংলা স্বদেশী গানে একটি নূতন মাত্রা যোগ করেছে। শোষিত মানুষের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠে স্বদেশী গান । এত কাল স্বদেশী গানে এসেছে পরাধীনতা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা; অর্থনৈতিক মুক্তির প্রসঙ্গও গানে ছিল, তবে তা এসেছে দেশের

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিক অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়োজনে। যেমন নীলচাষ কৃষকের জন্য মারাত্মক অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল; বিদেশী পণ্য বর্জন, স্বদেশী পণ্য ব্যবহার প্রভৃতির স্বপক্ষে অজস্র স্বদেশী গান লেখা হয়েছে। কিন্তু শোষিত, শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করা প্রভৃতি বিষয় গানে প্রধান বক্তব্য হিসেবে আসেনি। নজরুলই প্রথম এ ধরণের গান লিখেন। চল্লিশের দশকের শুরুতে গণসঙ্গীত নামে একটি নূতন ধারা বাংলা গানে পরিচিতি লাভ করে; যার সূচনা নজরুল করে গেছেন।

৩. **রাজনীতি বিষয়ক গানঃ** নজরুল বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে সরাসরি জড়িত ছিলেন না; তবে আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, সভাসমিতিতে অংশগ্রহণ, কারাবরণ, অনশনব্রত পালন ইত্যাদি সকল কিছুই তিনি করেছেন। এ সময়ে তাঁর রচিত কিছু উদ্দীপনামূলক গানকে রাজনীতি বিষয়ক গান হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। রাজনীতি বিষয়ক গানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ক. পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানঃ

পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানগুলি বৃটিশবিরোধী সংগ্রামে সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রামী মনোভাব এ সকল গানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ সকল গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গান হচ্ছে-

১। কারার ঐ লৌহ কপাট
২। বল ভাই মাভৈঃ মাভৈ
৩। এই শিকলপরা ছল মোদের এ শিকলপরা ছল
৪। তোরা সব জয়ধ্বনি কর
৫। মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম
৬। দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
৭। চল্ চল্ চল্
৮। আমরা শক্তি আমরা বল
৯। অগ্রপথিক হে সেনাদল।

ব্যঙ্গাত্মক গানঃ ব্যঙ্গগীতির সূচনা উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে; এর সঙ্গে দেশ চেতনার ব্যাপারটিকে যুক্ত করা যায়। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সংঘর্ষে আসা এবং শিক্ষিত বাঙালির অতি

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্য-প্রীতিই ছিল ব্যঙ্গগীতির বিষয়। ব্যঙ্গ এবং রঙ্গ উভয় ধারাতেই গান রচনা করেছিলেন নজরুল। ব্যঙ্গগীতির অধিকাংশই দেশ চেতনার পটভূমিতে রচিত এর মুখ্য বক্তব্য রাজনৈতিক।

'চন্দ্রবিন্দু' গ্রন্থের ১৮টি গান, 'সুর-সাকী'র কয়েকটি গান হাসির গান হিসেবে উল্লেখযোগ্য। 'চন্দ্রবিন্দু' গ্রন্থের অন্তর্গত কমিক গানগুলির বিশেষত্ব হচ্ছে এগুলোর প্রায় সবগুলোই রাজনৈতিক সামাজিক ঘটনাবলী বা সামাজিক অসঙ্গতির প্রেক্ষাপটে লেখা। যেমন বিশেষ করে 'প্যাক্ট' 'সর্দা বিল' , 'লীগ-অব-নেশনস', ডোমিনিয়ন স্টেটাস, 'রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স', 'সাইমন কমিশনের রিপোর্ট', 'প্রাথমিক শিক্ষা বিল' শীর্ষক গানগুলি নজরুলের গভীর রাজনৈতিক বোধের পরিচয় দেয়।

মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস তাঁকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ভেদে মানুষের প্রতি এমন অপরিসীম ভালোবাসা আর কারো মধ্যে দেখা যায় না। এ দিক থেকে তিনি অসাধারণ। তাঁর দেশাত্মবোধক গানগুলি দেশ, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে গভীর চিন্তা-চেতনার পরিচয় বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

বিবিধ গান

কাজী নজরুল ইসলাম সেপ্টেম্বর ১৯১৭ সালে ৪৯ নং বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দেন। করাচী সেনানিবাসে থাকাকালীন তাঁর সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত ঘটে। এসময় কলকাতার পত্র-পত্রিকায় তাঁর বিভিন্ন গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, গান প্রকাশ হতে থাকে। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে বাঙ্গালী পল্টন ভেঙ্গে দেওয়া হলে নজরুল করাচী থেকে কলকাতা চলে আসেন। তখন থেকে তাঁর সাহিত্য চর্চা পুরোপুরি চলতে থাকে। ১৯৪২ সালে অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। যদিও তিনি করাচী সেনানিবাসে থাকাকালীন সাহিত্যাঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করেন, কিন্তু তার সূচনা ঘটেছিল তারও বহু আগে। তাঁর কাব্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল ১০/১১ বৎসর বয়সে লেটো দলে থাকাকালীন সময়ে। নজরুলের বিবিধ গানের পর্যায়ে পড়ে সেসময়ে রচিত কিছু লেটো গান, পরিণত বয়সে লেখা নিছক হাস্যরসাত্মক গান ও কয়েকটি সাম্পানের গান।

লেটো গানের প্রথমেই থাকতো বন্দনা গীতি। তাঁর সে সময়ের একটি বন্দনা গীতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

সর্বপ্রথম বন্দনা গাই তোমারই ওগো বারী'তালা।
তারপরে দরুদ পড়ি মোহাম্মদ সাল্লে' আলা।
সকল পীর আর দরবেশ কুলে
সকল গুরুর চরণ মূলে
জানাই সালাম হস্ত তুলে
দোওয়া করো তোমরা সবে,
হয় যেন গো মুখ উজালা।
সর্বপ্রথম বন্দনা গাই
তোমারই ওগো বারী'তালা।।
তোমাইর ওগো খোদা'তালা।। [৫৩]

লেটো গান সে সময় কবির জন্মস্থান বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার গ্রামে-গঞ্জে জনপ্রিয় ছিল। লেটো গান গীতিনাট্যের মত যাত্রা ও আখড়াই ঢঙে অনুষ্ঠিত হত। নজরুল লেটো দলের জন্য বেশ অনেকগুলি পালা গান বা গীতিনাট্য রচনা করেন। যেমন আকবর বাদশা, কবি কালিদাস, ঠগপুরের সঙ, রাজপুত্র, দাতাকর্ণ, শকুনিবধ, মেঘনাদবধ ইত্যাদি। [৫৪]

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের তখনকার লেখায় ইংরেজী শব্দ প্রচুর এসেছে। প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে বাংলা-ইংরেজী শব্দ মিলিয়ে যে গান রচনা করেছেন তাতে প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে।

ওরে ছড়াদার that পাল্লাদার

মস্ত বড় mad,

চেহারাটাও monkey like

দেখতে ভারী cad.

Monkey লড়বে বাবর-কা সাথ্

ইয়ে বড় তাজ্জব বাত্

জানে না ও ছোট্র হলেও

হামভি lion lad [৫৫]

সেসময় কবিগান, যাত্রা, পাঁচালীতে মিশ্র ভাষার ব্যবহার বাহাদুরির পরিচায়ক ছিল। ঈশ্বরগুপ্ত ইংরেজী শব্দ বাংলা কবিতায় এনেছেন-

বিবিজান চ'লে যান লবেজান করে।।

--- --- ---

সাড়ীপরা এলোচুল আমাদের মেম।

বেলাক নেটিভ লেডি শেম্ শেম্ শেম্।[৫৬]

নজরুলের বাল্যরচনা সম্পর্কে আব্দুল কাদির মন্তব্য করেছেন। "-----নজরুলের কবিত্বশক্তি পল্লীর কবিওয়ালা বা লেটোওয়ালাদের বিচরণ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকতো, তা হলে এই 'ক্ষ্যাপা' কবির স্থান বড়জোড় লাভ হতো দাশরথি রায়, ভোলা ময়রা, ফিরিঙ্গি এন্টনী, গোবিন্দ অধিকারী. পাগলা কানাই প্রভৃতির পংক্তিতে"। [৫৭] সমালোচকের এই মন্তব্যকে স্বীকার করে নিয়ে বলতে হয়ে যদিও নজরুলের তখনকার লেখার প্রায় সবই অবলুপ্ত, মাত্র কিছু সংখ্যক গান পাওয়া গেছে, কিন্তু এই স্বল্প সংখ্যাক গানে প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। নিতান্ত অপরিণত হাতের লেখা হিসেবে এগুলোর সাহিত্যিক মূল্য তেমন নেই তবে এখান থেকেই তাঁর সঙ্গীত রচনার হাতেখড়ি হয়। প্রতিভার উন্মেষ পর্যায়ের রচনা হিসেবে এগুলো মূল্যবান।

বাংলা সাহিত্যে হাসির গান খুব বেশী লেখা হয়নি। উনিশ শতকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ব্যঙ্গ কবিতার ধারা সৃষ্টি করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানে এই ধারাটি সমৃদ্ধি লাভ করেছে। উনিশ শতকে ইংরেজী শাসন শোষনের প্রতিবাদে সমাজ জীবনে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় একে উপজীব্য

Dhaka University Institutional Repository

করে ব্যঙ্গ রচনার ধারাটি সমৃদ্ধ হয়েছে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পরাধীন ভারতবর্ষে সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা চরম আকার ধারণ করে; সেই কালপর্বে সাহিত্যাঙ্গনে নজরুলের আবির্ভাব। তিনি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যঙ্গগীতির ধারায় বেশ অনেকগুলি গান রচনা করেন। তবে নিছক হাস্যরস উদ্রেককারী গানের সংখ্যাও কম নয়। আব্দুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত নজরুলগীতি অখন্ড সংস্করণে মোট ১০১ টি হাসির গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[৫৮] করুণাময় গোস্বামী 'নজরুলগীতি প্রসঙ্গ' গ্রন্থে নিছক হাস্যরস উদ্রেককারী কিছু গানের উল্লেখ করেছেন। এ ধরণের ৪৭ টি গানের উল্লেখ রয়েছে। এ ধরণের গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রেকর্ডে রঞ্জিত রায়ের গাওয়া 'আমার খোকার মাসি' সে সময়ে দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।[৫৯]

সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন অসঙ্গতি নিয়ে তিনি গান লিখেছেন। ছোট খাট বিষয়ও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। এধরণের কৌতুক প্রধান গান হচ্ছে 'সুর-সাকী'র সর্বশেষ কীর্তনটি। সমাজে এমন বহু লোক আছে যারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে। এরা ঈশ্বরের নাম নিয়ে জাগতিক ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে। অনাবিল হাসির গান হিসেবে এই গানটি বিখ্যাত।

আমার হরিনামে রুচি
কারণ পরিনামে লুচি
আমি ভোজনের লাগি' করি ভজন।
আমি মালপোর লাগি তল্পী বাঁধিয়া
এ কল্প -লোকে এসেছি মন।।[৬০]

সামগ্রিকভাবে নজরুলের হাসির গানে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপসহ কৌতুকরসের প্রাধান্য দেখা যায়। Humour বা Wit এর চেয়ে Satire বেশী এসেছে। সে সাথে Fun ও রয়েছে।

১৯২৬ সালের মাঝামাঝি এব ১৯২৯ ও ১৯৩২ সালের শেষের দিকে তিনবার নজরুল চট্টগ্রাম ভ্রমণ করেন। সে সময় তিনি রচনা করেন কয়েকটি সুন্দর কবিতা ও সাম্পানের গান্।[৬১] আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলীতে সাম্পানের গান রয়েছে মোট তিনটি। গানগুলি হচ্ছেঃ 'ওরে মাঝি ভাই', 'কি হইব লাল বাওটা তুইল্যা সাম্পানের উপর', ' তোমার কূলে তুইলা বন্ধু আমি নামছি জলে'।[৬২]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল গীতিকা, ডিএম লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৭৮, পৃ. ২৭

২. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও সৃষ্টি, কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২য় সং, ১৯৯৭, পৃ. ৫৭৫

৩. করুণাময় গোস্বামী, নজরুলগীতি প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৭৮, পৃ. ৫২৫

৪. আব্দুল আজীজ আল-আমান (সম্পাদিত) নজরুলগীতি অখণ্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. সূচীপত্র-৯

৫. নারায়ণ চৌধুরী, নজরুল চর্চা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৯০, পৃ. ৯৫-৯৮

৬. নারায়ণ চৌধুরী, কাজী নজরুলের গান, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ ১৯৭৭, পৃঃ ৪৫

৭. করুণাময় গোস্বামী, বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, পৃ. ১-৭

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৯. করুণাময় গোস্বামী, রবীন্দ্র সংগীত পরিক্রমা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ. ৩৪-৩৫

১০. রথীন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদিত) দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ১ম খ., সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৬৬, ভূমিকা, পৃ. ১২

১১. করুণাময় গোস্বামী, বাংলা গানের বিবর্তন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩২৮

১২. সুনীলময় ঘোষ, অতুলপ্রসাদ সমগ্র, সাহিত্যম্, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১

১৩. আবদুল কাদির (সম্পাদিত) নজরুল রচনাবলী, ১ম খ., বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৮

১৪. করুণাময় গোস্বামী, নজরুলগীতি প্রসঙ্গে, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৯০, পৃ. ১৬৩

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

১৭. প্রাগুক্ত, ১৬৯

১৮. রফিকুল ইসলাম, নজরুল প্রসঙ্গে, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৯৮

১৯. আতোয়ার রহমান, নজরুল বর্ণালী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১০৫

২০. রফিকুল ইসলাম, গীতি সংকলন ২য় খ., বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫, পৃ. ৫

২১. করুণাময় গোস্বামী, নজরুলগীতি প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০, পৃ. ২৬৮

২২. আব্দুল আজীজ আল-আমান (সম্পাদিত) নজরুলগীতি অখণ্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২৫১-৩৭৯

২৩. রফিকুল ইসলাম, নজরুল প্রসঙ্গে, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ৯৮, পৃ. ১৯৮

২৪. আসাদুল হক, ইসলামী ঐতিহ্যে নজরুল সঙ্গীত, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, পৃ. ৭

২৫. আসাদুল হক, ইসলামী ঐতিহ্যে নজরুল সঙ্গীত, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৮

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

২৭. করুণাময় গোস্বামী, নজরুলগীতি প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৯০, পৃ. ১

২৮. আবদুল কাদির, যুগ-কবি নজরুল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬, পৃ. ২

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

৩১. করুণাময় গোস্বামী, নজরুলগীতি প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০, পৃ. ৮১
৩২. কল্যাণী কাজী (সম্পাদিত) শত কথায় নজরুল, সাহিত্যম্, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৪০৫, পৃ. ৩৬৭
৩৩. রফিকুল ইসলাম, নজরুল প্রসঙ্গে, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৯৮
৩৪. মাযহারুল ইসলাম, ড., কবি হেয়াত মামুদ, ১ম প্রকাশ, রাজশাহী, বাংলা বিভাগ, ১৯৬১, পৃ. ১
৩৫. আহমদ শরীফ, সৈয়দ সুলতান বিরচিত নবী বংশ ১ম খ., বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৮, পৃ. ১
৩৬. আবদুস সাত্তার, নজরুল কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১৪
৩৭. গোলাম সাকলায়েন, মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক, ঢাকা, নওরাজ কিতাবিস্তান, ১ম সং, ১৯৬৭, পৃ. ৬৩
৩৮. আবদুস সাত্তার, নজরুল কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১৫
৩৯. সুকুমার রায়, বাংলা সংগীতের রূপ, কলিকাতা, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৬, পু. মু. ১৯৯১, পৃ. ১৩০
৪০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৯৭৫
৪১. স্বামী বামদেবানন্দ, সাধক রামপ্রসাদ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৫শ পু. মু. ২০০৫, পৃ. ৬৫
৪২. অরুণকুমার বসু, বাংলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত, ১ম সং, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৮, পৃ. ১১
৪৩. করুণাময় গোস্বামী, নজরুলগীতি প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২৫৫
৪৪. আবদুল কাদির (সম্পাদিত) নজরুল রচনাবলী ২য় খ. (সুর-সাকী), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৯৮
৪৫. প্রাগুক্ত, নজরুল রচনাবলী ২য় খ. (গানের মালা), পৃ. ৪৭২
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭১
৪৭. প্রাগুক্ত, নজরুল রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড (রাঙা জবা), পৃ. ১৮৬
৪৮. প্রাগুক্ত, (গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত), পৃ. ৭৩৩
৪৯. প্রাগুক্ত, নজরুল রচনাবলী ২য় খ. (সুর-সাকী), পৃ. ১৯৫
৫০. আজহারউদ্দিন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৪৫৮
৫১. অরুণকুমার বসু, বাংলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত, কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী, ১ম সং, ১৯৭৮, পৃ. ১৯৫
৫২. আবদুল কাদির (সম্পাদিত) নজরুল রচনাবলী ১ম খ. (রুদ্রমঙ্গল), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৮৬৯
৫৩. আবদুল কাদির, যুগ-কবি নজরুল, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৪২
৫৪. আবদুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
৫৬. আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত) ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৬, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১৫৬
৫৭. আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৯, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, পৃ. ১
৫৮. আবদুল আজীজ আল-আমান (সম্পাদিত) নজরুল গীতি অখণ্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৪৭১-৫১০
৫৯. করুণাময় গোস্বামী, নজরুল গীতি প্রসঙ্গ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ. ৩১৫
৬০. প্রাগুক্ত, নজরুল রচনাবলী, ২য় খ. (সুর-সাকী), পৃ. ২১৫
৬১. মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত) চট্টগ্রামে নজরুল, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৫
৬২. প্রাগুক্ত, নজরুল রচনাবলী, ৩য় খ. (সাম্পানের গান, ঝড়) পৃ. ৩৭৮-৩৭৯

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
নজরুলের সমাজসচেতন সঙ্গীত

নজরুল ছিলেন সম্পূর্ণরূপে সমাজচেতন, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন তিনি। করাচীতে বাঙালী পল্টনে থাকাকালীন (১৯১৭) রুশ বিপ্লব সম্পর্কে তিনি খোঁজ-খবর রাখতেন সে সময় তাঁর লেখা 'ব্যথার দান' গল্প থেকে বুঝা যায় রুশ বিপ্লবের প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ জন্মেছিল। পরবর্তী সময়ে ১৯২১ সালে ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। মুজফফ্র আহমদের মতে, কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ নিলে নজরুল তাঁদের সাথে ছিলেন। যদিও তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য কখনও হননি।

শৈশবের পারিবারিক পরিবেশ, কঠিন জীবন-সংগ্রাম, বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫-১৯১১)আন্দোলন চলাকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রভৃতি তাঁর উপর প্রভাব ফেলেছে। পরবর্তী সময়ে কলকাতায় (১৯২০) সাহিত্য চর্চায় সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হলে এ সময় থেকে শুরু করে ১৯৪২ সালে অসুস্থ হওয়ার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর মানসিক পরিমন্ডলকে দেশাত্মবোধক চেতনায় সমৃদ্ধ করেছে।

গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করে তিনি 'চরকার গান' (১৩৩১) লিখেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে গান্ধীর আদর্শকে মেনে নিতে পারেননি, সশস্ত্র বিপ্লবের পন্থা থেকেও সরে এসেছেন। কিন্তু জনগণের দাবী রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, সর্বপ্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে কাজ করে যাওয়ার পথ থেকে তিনি সরে আসেননি; এ লক্ষ্য অর্জনে তিনি সাহিত্যকে হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছেন। অজস্র উদ্দীপনাময় কবিতা, গান, প্রবন্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন তিনি।

তিনি বলেছেন, "আমার কাব্য আমার গান আমার জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য হতে জন্ম নিয়েছে। আমি জীবনের ছন্দে গেয়ে চলেছি এসব তারই প্রকাশ।"[১] আর সঙ্গীত সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে আশাবাদী ছিলেন। তিনি সঙ্গীতে অমরত্ব আশা করেছেন; "কাব্যে ও সাহিত্যে আমি কি দিয়েছি, জানি না। আমার আবেগে যা এসেছিল, তাই আমি সহজভাবে বলেছি, আমি যা

Dhaka University Institutional Repository

অনুভব করেছি, তাই আমি বলেছি। ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু সঙ্গীতে যা দিয়েছি, সে সম্বন্ধে আজ কোন আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে , ইতিহাস লেখা হবে তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই। তবে এইটুকু মনে আছে সঙ্গীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি।"[২]

অজস্র উদ্দীপনামূলক গান সেসময় জনগণের দেশপ্রেমের চেতনাকে শাণিত করেছে; স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাকে করেছে উজ্জীবিত। এধরণের উদ্দীপনামূলক গানকে কয়েকটি শিরোনামে বিভক্ত করা যায়ঃ

১। শ্রমজীবীদের গান

২। নারী জাগরণমূলক গান

৩। হিন্দু মুসলিম জাগরণমূলক গান

৪। দেশপ্রেম মূলক গান

৫। স্বাধীনতা ও রাজনীতিভিত্তিক গান।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
শ্রমজীবীদের গান

হিন্দুমেলা (১৮৬৭) কে কেন্দ্র করে স্বদেশী সংগীতের যাত্রা শুরু। পরবর্তীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে এই পর্যায়ের গান অসাধারণ উদ্দীপনামূলক ছিল। নজরুলের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত এই শ্রেণীর গান ছিল সংকীর্ণ জাত্যাভিমান, পরাধীনতার বেদনা, পরাধীনতা মোচনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্ভাসিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব যখন বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি করেছে এবং অবধারিতভাবে তৃতীয় বিশ্বভুক্ত ভারতবর্ষে এর প্রভাব পড়েছে আরও প্রকট হয়ে, তখন স্বদেশী গানের ধারায় যুক্ত হয়েছে নূতন মাত্রা আর্ন্ত-জাতিকতা। বিশেষত: সোভিয়েট ইউনিয়নের অক্টোবর বিপ্লবের (১৯১৭) পর বিশ্বব্যাপী শ্রমিক শ্রেণীর নবজাগরণের প্রেক্ষিতে বাংলা গান সাম্রাজ্যবাদ, বৈষম্যমুক্তি, শোষণ নির্যাতনের বিপক্ষে গর্জে উঠার হাতিয়ারে পরিণত হয়। এতকাল গানে কৃষক-শ্রমিকদের বঞ্চনার চিত্র ছিল না। নজরুলই সর্বপ্রথম শ্রমিক শ্রেণীর গান লিখে বাংলা দেশাত্মবোধক গানকে বিশ্বচেতনায় উন্নীত করেন।

৬ই-৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ তারিখে কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল। নজরুল ইসলামের শ্রমিকের গান এই সম্মেলনেরই উদ্বোধনী সঙ্গীতরূপে রচিত হয়েছিল।[৩] গানটি এরূপ-

ওরে ধ্বংস পথের যাত্রী দল!
ধর হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল।
আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই
পায়ের সুখে ভাঙব কল।
ধর হাতুরি, তোল কাধে শাবল।।[৪]

শ্রমিকের গানে কবি শ্রমিক শ্রেণীর বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। শ্রমিক শ্রেণী উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তারা শুধু শ্রমই দিয়ে যায়। উৎপাদনের ফল ভোগ করে ধনিক শ্রেণী। এ গানে নজরুল শ্রমিককে মাটির নিচে খনিতে, সমুদ্রে কখনো বা আকাশে সভ্যতার নির্মাতা হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছেন। পূজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায়

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার শ্রমিক শ্রেণী 'কলুর বলদ' বা 'চিনির বলদ' এর মত শ্রম দিয়ে যায়। তাই কবি বলেছেন,

যত শ্রমিক শুষে নিঙড়ে প্রজা
রাজা উজির মারছে মজা,
আমরা মরি বয়ে তাদের বোঝা রে।।

--- --- ---

ও ভাই দালান-বাড়ি আমরা গ'ড়ে
রইনু জন্ম ধুলায় প'ড়ে
বেড়ায় ধনী মোদের ঘাড়ে চড়ে রে !
আমরা চিনির বলদ চিনি নে স্বাদ
চিনি বওয়াই সার কেবল।
ধর, হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।।[৫]

সকল বঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে কবি 'শ্রমিকের গান'-এ শ্রমিকদের আত্মপ্রত্যয়ী হতে বলেছেন-

আবার নতুন করে মল্লভূমে
গর্জাবে ভাই দল-মাদল!
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ।।[৬]

একই ধরণের আরেকটি গান 'জাগর-তূর্য'-এ কবি শ্রমিক শক্তির বন্দনা করেছেন। গানটি কলিকাতায় ১লা বৈশাখ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে রচিত।[৭]

ওরে ও শ্রমিক, সব মহিমার উত্তর-অধিকারী।
অলিখিত যত গল্প কাহিনী তোরা যে নায়ক তারি।।

--- --- ---

নিদ্রোত্থিত কেশরীর মতো
ওঠ ঘুম ছাড়ি' নব জাগ্রত!
আয় রে অজেয় আয় অগণিত দলে দলে মরুচারী ।।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

[illegible] Peoples Flag is Deepest Red" [illegible]

[illegible]

[illegible] (Hell. a Verse Beama) [illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

নব জনম লভি অভিনব ধরণী

ওরে ওই আগত।।[১৩]

কবি সর্বহারা শ্রেণীকে আদি শাস্ত্র-আচারের শৃঙ্খল ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে অধিকার প্রতিষ্ঠার বিপ্লবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান করেছেন। নিখিল মানব জাতির মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়েই সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তি আসবে। শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবোধ এই গানে সুস্পষ্ট।

ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম মাঝ
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাড়া সবে আজ
এই "অন্তর-ন্যাশনাল-সংহতি "রে
হবে নিখিল-মানব-জাতি সমুদ্ধত।।[১৪]

লাঙলের দ্বিতীয় সংখ্যায় নজরুলের বিখ্যাত 'কৃষাণের গান' বের হয়েছিল ১৯২৬ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে।[১৫] নজরুল কৃষক শ্রেণীর ওপর ধনিক বণিক শ্রেণীর শোষণের চিত্র একেছেন। শস্য উৎপাদনের সাথে জড়িত কৃষক শ্রেণী আজ নিরন্ন। অন্ন, বস্ত্রের অভাবে কৃষকের জীবন বিপন্ন।

আজ চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
ওভাই জোঁকের মতন শুষ্‌ছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত,
মোর বুকের কাছে মরছে খোকা, নাই ক'আমার হাত।
আজ সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেলছে খেলা খল।।[১৬]

'কৃষাণের গান'-এ নজরুল ক্ষুধার্ত, সর্বহারা কৃষকদের ঘুম ভাঙাতে নতুন আশার বাণী শুনিয়েছেন-

আজ জাগরে কৃষাণ, সব ত গেছে কিসের বা আর ভয়
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।[১৭]

১৯২৬ সালের ১১ই ও ১২ মার্চ তারিখে মাদারিপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎসজীবী সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীতরূপে তিনি রচনা করেন 'ধীবরদের গান'।[১৮] ধীবরদের গানে নজরুল জেলেদেরকে আত্মসচেতন হওয়ার আহ্বান করেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

আমরা নীচে পড়ে রইব না আর
শোন রে ও ভাই জেলে,
এবার উঠব রে সব ঠেলে!
ঐ বিশ্ব-সভায় উঠল সবাই রে,
ঐ মুটে-মজুর হেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে।।[১৯]

ধীবরদের উপর শোষণ নির্যাতনের চিত্র অঙ্কন করে নজরুল সাম্রাজ্যবাদী শোষক শ্রেণীর মুখোশ উন্মোচন করেছেন। জেলেরা ঝড়ের মুখে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাছ শিকার করে। তাদের উপার্জিত মুনাফা অত্যাচারী মহাজনেরা কেড়ে নেয়।

তাই জীবন মোদের ভেসে বেড়ায়
ঝড়ের মুখে নায়ে,
ও ভাই নিত্য-নূতন হুকুম জারি
করছে তাই সব অত্যাচারী রে,
তারা বাজের মতন ছোঁ মেরে খায়
আমরা মৎস পেলে।[২০]

নজরুলের এ সকল গান বাংলা স্বদেশী গানে একটি নূতন মাত্রা যোগ করেছে। শোষিত মানুষের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠে স্বদেশী গান। এতকাল স্বদেশী গানে এসেছে পরাধীনতা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা; অর্থনৈতিক মুক্তির প্রসঙ্গও গানে ছিল তবে তা এসেছে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়োজনে। যেমন নীলচাষের ক্ষতিকর দিক, স্বদেশী পণ্য গ্রহন, বিদেশী পণ্য বর্জন প্রভৃতির স্বপক্ষে অজস্র স্বদেশী গান লেখা হয়েছে। কিন্তু শোষিত, শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন, শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করা প্রভৃতি বিষয় গানে প্রধান বক্তব্য হিসেবে আসেনি। চল্লিশের দশকের শুরুতে গণসঙ্গীত নামে একটি নূতন ধারা বাংলা গানে পরিচিতি লাভ করে; যার সূচনা নজরুল করে গেছেন। চল্লিশের দশকে গণনাট্য আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে গণসংগীতের এক সুবর্ণ যুগ সৃষ্টি করে। এই আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করেছে এমন উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেনঃ বিনয় রায় (১৯১৮-১৯৭৫), জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (১৯১১-১৯৭৭), সলিল চৌধুরী (১৯২২-১৯৯৫) হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৯২২-১৯৮৭) প্রমুখ।

গণসংগীতের রূপকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেছেন, "স্বাদেশিকতার ধারা যেখানে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার সাগরে গিয়ে মিশেছে সেই মোহনায় গণসংগীতের জন্ম।"[২১] এই মন্তব্যের আলোকে বলা যায় বাংলা গানে নজরুলই গণসংগীতের পথিকৃৎ। আজও এ সকল গান বাঙালীর জীবনে চিরকালীন প্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। আবদুল কাদির (সম্পাদিত) নজরুল রচনাবলী ৪র্থ খ. (স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.১১৫।

২। নজরুল রচনাবলী ৪র্থ খ. (জন-সাহিত্য), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

৩। মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ. ২৫৯

৪। আবদুল কাদির (সম্পাদিত) নজরুল রচনাবলী ১ম খ. (শ্রমিকের গান, সর্বহারা), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২৮১

৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২-২৮৩

৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪

৭। সুশীলকুমার গুপ্ত, নজরুল চরিতমানস, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১৮৯

৮। নজরুল রচনাবলী ১ম খ. (ফণি-মনসা, জাগর তূর্য) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১

৯। দীপা মুখোপাধ্যায় ও সুহাস চৌধুরী (সম্পাদিত) সলিল চৌধুরীর গান, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃ, ৪

১০। কল্পতরু সেনগুপ্ত, নজরুলগীতি সহায়িকা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমী, ১৯৯৭ , পৃ. ১২৮

১১। নজরুল রচনাবলী ১ম খ. (রক্ত-পতাকার গান, ফণি-মনসা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯

১২। মুজফ্ফর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-১৩৫

১৩। নজরুল রচনাবলী ১ম খ. (অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত, ফণি-মনসা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০

১৫। কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৫৩

১৬। নজরুল রচনাবলী ১ম খ. (কৃষাণের গান, সর্বহারা), পৃ. ২৯১

১৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

১৮। করুণাময় গোস্বামী, নজরুল গীতি প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২৭

১৯। নজরুল রচনাবলী ১ম খ. (ধীবরদের গান, সর্বহারা), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪

২০। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪

২১। দিলীপ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) গণনাট্য সংঘের গান, গণমন প্রকাশন, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নারী জাগরণমূলক গান

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালী সমাজে যে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার প্রাণদাতা ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। বাঙালী হিন্দু সমাজে শত শত বৎসর ধরে প্রচলিত সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম কলম ধরেন তিনি। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর লেখা ৩টি বইঃ সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ (১৮১৮), সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯) এবং সহমরণ (১৮২৩)। লেখালেখির পাশাপাশি তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টার কারণে ১৮২৯ সালে 'সতীদাহ নিবারণ আইন' (১৮২৯) প্রণীত হয়।

সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ হওয়ার পর বিধবা বিবাহ প্রচলনের পক্ষে জোড়ালো আন্দোলন শুরু হয়। বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৯৯১) এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এ সংক্রান্ত তাঁর লেখা দু'টি গ্রন্থ প্রকাশ হয়। 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১ম খন্ড ১৮৫৫, ২য় খন্ড ১৮৫৫)। ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন হয়। এছাড়া বহু বিবাহ রোধকল্পে লেখেন বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার (১ম খন্ড-১৮৭১, ২য় খন্ড -১৮৭৩)।

উনিশ শতকে আরও যাঁরা হিন্দু নারীদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন এমন কয়েকজন সমাজসংস্কারক হচ্ছেন রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৬) অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) দ্বারাকানাথ গাঙ্গুলী (১৮৪৪-১৮৯৮), দূর্গামোহন দাস (১৮৪১-১৮৯৭) প্রমুখ।

সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি নারী শিক্ষা চালু এবং অবরোধ প্রথা দূর করার প্রচেষ্টাও চলতে থাকে।

বাঙালী মেয়েদের মধ্যে পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রসারে প্রথম এগিয়ে এসেছিল খ্রিস্টান মিশনারী সম্প্রদায়, উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী মেয়েদের খ্রিস্টান করা। এ উদ্দেশ্যে ১৮১৪ সালে চুচুড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয়, ১৮১৭ সালে 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি' নামে আরও একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] মিশনারীদের প্রচেষ্টার বাইরে এদেশীয়দের উদ্যোগে ১৮৪৭ সালে বারাসতে প্রথম বালিকা

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ।[২] ১৮৪৯ সালের মে মাসে জে ই ডি বেথুন কলকাতায় স্থাপন করেন ভিক্টোরিয়া গার্লস স্কুল। পরে এটি পরিচিত হয় বেথুন স্কুল নামে। এর মাধ্যমে বাঙলায় প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার সূচনা।[৩] প্রাতিষ্ঠানিক নারী শিক্ষার প্রচলনের প্রথম পর্যায়ে মুসলিম নারী ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বী নারীরা শিক্ষা দীক্ষায় এগিয়ে যায়। এর প্রমাণ স্বরূপ দেখা যায় ১৮৮৩ সালে কাদম্বিনী বসু [ব্রাহ্ম] প্রথম বি. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৮৮৪ সালে চন্দ্রমুখী বসু [খ্রিস্টান] প্রথম এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন। [৪]

কিন্তু মুসলিম নারীদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছেছে অনেক দেরীতে। এ ব্যাপারে সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯-১৯২৮) মানসিকতা ছিল প্রগতিশীল। তিনি ১৮৯৯ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে' সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন যে, মেয়েদের শিক্ষা ছেলেদের শিক্ষার সমান্তরালভাবে চলা উচিত। তাতেই সমাজে ভারসাম্য রক্ষিত হবে। পুরুষ নারী একত্রে সমান উন্নতি করতে না পারলে প্রকৃত সুফল পাওয়া যাবে না।[৫] তিনি নারী শিক্ষার স্বপক্ষে অভিমত দিলেও সে শিক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কোন চেষ্টা করেননি।

সৈয়দ আমীর আলীর চেয়ে বরং কর্মের দিক দিয়ে বেশী অগ্রসর ছিলেন নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী (১৮৩৪-১৯০৩)। ১৮৭৩ সালে তিনি সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে কুমিল্লায় একটি উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। হোস্টেলে মেয়েদের মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। তিনি পশ্চিম গাওয়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৬] কিন্তু তিনি তাঁর চিন্তাকে লেখনীর মাধ্যমে রূপ দেননি। তাই এটি কোন আন্দোলনে রূপ পায়নি। এরূপ কোন চেষ্টাও তাঁর ছিল না। সেদিক থেকে বেগম রোকেয়া অগ্রসর চিন্তার অধিকারী ছিলেন।

মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে ১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাঁরা গৃহশিক্ষাকে অবলম্বন করে বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করে। যারা পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাত তাদের সার্টিফিকেট ও পারিতোষিক দেওয়া হত। [৭] ১৮৯৭ সালের ১৯ জানুয়ারী মুসলিম মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিদ্যালয়ের নাম 'মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা'; ২৫ জন ছাত্রী নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। [৮]

মুসলমান নারীরা যখন ধর্মীয় বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ; ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বলে তাদের কিছুই ছিল না; সেই দুর্যোগময় মুহূর্তে শিক্ষার আলোক বর্তিকা হাতে বেগম

Dhaka University Institutional Repository

রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) আবির্ভূত হন। তিনি লেখনীর মাধ্যমে নারী মুক্তির বাণী প্রচার করেন। তিনি মনে করতেন মুসলমানের পর্দাপ্রথাই নারী শিক্ষার প্রধান অন্তরায়, উপযুক্ত শিক্ষা পেলে নারী স্বাবলম্বী হতে পারবে এবং তার ব্যক্তি স্বাধীনতা লাভ হবে। তিনি মতিচুর (১৯০৪), সুলতানার স্বপ্ন (১৯০৫), অবরোধবাসিনী (১৯২৮) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ১৯১১ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বেগম রোকেয়ার কর্মোজ্জ্বল জীবন বাঙালী মুসলমান নারী মুক্তির ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করে।

ইতোমধ্যে ১৯২৭ সালে বাঙালী মুসলমান নারীদের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করেন ফজিলাতুন্নেসা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্ক শাস্ত্রে মিশ্র বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করেন।[৯] নারী জাগরণের পরবর্তী ইতিহাস মুসলিম নারীদের পদচারণায় মুখরিত।

মুসলমানদের মধ্যে নারী মুক্তির বার্তা পৌঁছে দিতে যে ক'জন এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম অন্যতম। নজরুলের বিভিন্ন গানে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সহমর্মিতার পাশাপাশি সামাজিক অধিকার আদায়ে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান রয়েছে।

বুলবুল (১৯২৮) সঙ্গীতগ্রন্থের ৩৮নং গানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী ফজিলাতুন্নেসাকে নিয়ে এ গানটি রচিত। ফজিলাতুন্নেসা ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্টেট স্কলারশীপ নিয়ে উচ্চ শিক্ষার্থে বিলাত গমন করেন। তাঁর বিদেশ যাত্রার সময় 'সওগাত' অফিসে আয়োজিত বিদায় সংবর্ধনায় নজরুল এ গানটি গেয়েছিলেন।[১০] গানটি এরূপ-

জাগিলে "পারুল" কিগো "সাত ভাই চম্পা" ডাকে।
উদিলে চন্দ্র লেখা বাদলের মেঘের ফাঁকে।
চলিলে সাগর ঘু'রে
অলঙ্কার মায়ার পুরে,
ফোটে ফুল নিত্য যেথায়
জীবনের ফুল্ল শাখে।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল ফজিলাতুন্নেসাকে রূপকার্থে 'সাত ভাই চম্পা'র একমাত্র বোন 'পারুল' বলে অভিহিত করেছেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নারী শিক্ষার ব্যাপারে সমাজে একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়। কিন্তু মুসলিম নারী ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বীরা এক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। এমন সামাজিক প্রেক্ষাপটে ফজিলাতুন্নেসার শিক্ষাক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বকে নজরুল মেঘের ফাঁকে চন্দ্রালোকের আভা স্বরূপ মনে করেছেন।

নারী জাগরণবিষয়ক তাঁর সর্বাধিক পরিচিত একটি গান 'জাগো নারী জাগো বহ্নি শিখা', গানটির রচনাকাল ১৯৩১; নজরুল গীতিকায় অন্তর্ভুক্ত জাতীয় সঙ্গীত শিরোনামের ১৭ নম্বর গান এটি। তালঃ ত্রিতাল; সারং কাওয়ালী রাগে রচিত; প্রকাশঃ জয়তী বৈশাখ ১৩৩৭;[১২] রাগের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গানে বীররসের পাশাপাশি কোথাও কোথাও কোমলতাও এসেছে। গানের শুরুতে অগ্নি শিখার প্রচন্ড শক্তিমত্তায় নারীকে জেগে উঠার আহ্বান করছেন। সেই জাগরণ যেন হয় স্বাহা অর্থাৎ অগ্নিদেব জায়ার সীমন্তের রক্ত তিলকের মত উজ্জ্বল। নারী তার বাসনাগুলি উলঙ্গভাবে লেলিহান শিখাসম ছড়িয়ে দিবে এই প্রত্যাশা করে নজরুল বলছেনঃ

জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা।
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত টিকা।।
দিকে দিকে মেলি তব লেলিহান রসনা,
নেচে চল উন্মাদিনী দিগ্‌বসনা।।[১৩]

লাঞ্ছিত, অপমানিত নারীকে অত্যাচার লাঞ্ছনা-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে আহবান করেছেন-

ধূ ধূ জ্বলে ওঠে ধূমায়িত অগ্নি
জাগো মাতা, কন্যা, বধূ, জায়া, ভগ্নি![১৪]

এখানে পৌরাণিক প্রসঙ্গ যেমন স্বাহা, জাহ্নবী এসেছে। জাহ্নবী যেমন জহ্নুমুনির যজ্ঞভূমি প্লাবিত করে তাঁর যজ্ঞোপকরণাদি ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি বিপুল বিক্রমে নারীরাও জেগে উঠবে, এই জাগরণ বজ্রসম কঠিন হবে, পরাজিতা নারী জয়ের পতাকা হাতে চিরবিজয়িনী হবে।

পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ-স্খলিতা
জাহ্নবী সম বেগে জাগো পদ-দলিতা,
মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা,
চির-বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা।।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

'চন্দ্রবিন্দু' গ্রন্থের ৩৬ নং গানটি ভৈরবী রাগে, আদ্ধাকাওয়ালী তালে রচিত। এই গানটিতে নজরুল নব বধূকে সংসারের জন্য কল্যাণময়ী হিসেবে আবির্ভূত হতে বলেছেন।

জাগো-
জাগো বধূ জাগো নব বাসরে
গৃহ-দীপ জ্বালো কল্যাণ-করে।।[১৬]

'বুলবুল' দ্বিতীয় খন্ডে ইতিহাস খ্যাত বীরাঙ্গনা নারী চাঁদ সুলতানাকে নিয়ে লেখা গান রয়েছে। গানটি দাদরা তালে নিবদ্ধ। আহমদ নগরের সুলতান হুসাইন নিযাম শাহের কন্যা এবং বিজাপুর রাজ্যের বিধবা মহিষী চাঁদ সুলতানা (মৃ: আনু ১৬০০ খ্রীস্টাব্দ)। ১৬৯৫ সালে আকবরের পুত্র মুরাদ এবং বৈরাম খাঁর পুত্র আব্দুর রহিম খান-ই-খানান বিরাট সেনাদল নিয়ে বিজাপুর রাজ্য আক্রমন করলে তিনি বিপুল বিক্রমে আক্রমণ প্রতিহত করেন। ১৫৯৬ সালে মোগলদের সাথে তাঁর সন্ধি স্থাপিত হয়।[১৭] নজরুল চাঁদ সুলতানাকে যথোচিত সম্মান জানিয়ে লিখেছেন-

চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা, চাঁদের চেয়েও জ্যোতি
তুমি দেখাইলে, মহিমান্বিতা, নারী কি শক্তিমতি।।[১৮]

নারী প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারি ধরতে পারে চাঁদ সুলতানার উদাহরণ দিয়ে নজরুল তা প্রমাণ করেছেন। চাঁদ সুলতানার বীরত্ব তিনি বাঙালী নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে চান। তাই তিনি তাঁর প্রত্যাবর্তন আশা করেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনে পৃথিবীতে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আগমন ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে চাঁদ সুলতানার প্রত্যাবর্তন কামনা করে তিনি বোঝাতে চাইছেন পৃথিবীতে নারীরা বীরত্বে, গৌরবে মাথা উঁচু করে সম্মানজনক অবস্থানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করুক।

শিখালে কাঁকন চুড়ি পরিয়াও নারী
ধরিতে পারে যে উদ্ধত তরবারি-
যদি না রহিত অবরোধের দুর্গে হতো না এ-দুর্গতি ।।
তুমি দেখালে নারীর শক্তি-স্বরূপ চিন্ময়ী কল্যাণী
ভারত-জয়ীর দর্প নাশিয়া, মুছালে নারীর গ্লানি।

তাই গোলকুন্ডার কোহিনূর হীরা-সম
আজো ইতিহাসে জ্বলিতেছ নিরুপম।
রণরঙ্গিনী ফিরে এসো-

Dhaka University Institutional Repository

তুমি ফিরিয়া আসিলে, ফিরিয়া আসিবে লক্ষ্মী ও সরস্বতী।।[১৯]

১৯৬৬ সালে নজরুলের শ্যামসঙ্গীতের সংকলনগ্রন্থ 'রাঙা জবা' প্রকাশিত হয়। শ্যামাসঙ্গীত দেবী শ্যামা বা কালীর নামে রচিত হিন্দু ধর্ম সঙ্গীত। ধর্মীয় উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে কোথাও কোথাও কালী দেবীকে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ৯৫ নং গানটি এরকম-

এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্নি,
হে প্রলয়ঙ্কর!
রুদ্র ভৈরব সৃষ্টি
সংহর সংহর।।
--- --- ---
যেথা দেবী শক্তি নারী
অপমান সহে,
গ্লানিকর হানাহানি চলে
ধর্মের মোহে।
হানো সংঘাত অভিসম্পাত
সেথা নিরন্তর।।[২০]

নজরুলের গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত প্রচুর গান রয়েছে। এমনি একটি গান 'আমাদের নারী' গানটি মালকোষ রাগে, দাদরা তালে নিবদ্ধ; গানটির রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে আব্বাসউদ্দীন স্মৃতি কথায় বলেছেন,

"কাজীদার বাড়ীতে একদিন বসে আছি! কারমাইকেল হোস্টেল থেকে চার-পাঁচজন ছাত্র এসে কাজীদাকে বললেন, 'কাজী সাহেব, আমাদের হোস্টেলে আসছেন তুরস্ক থেকে হালিদা এদিব হানুম, তাঁকে আমরা অভ্যর্থনা জানাবো, আপনাকে সভাপতি হতে হবে।' কাজীদা বললেন, 'আচ্ছা যাবো আপনারা যান। ছেলেরা চলে গেলো। কাজীদা আমাকে বললেন, 'জানো আব্বাস, এই হালিদা এদিব হচ্ছেন তুরস্কের নারী জাগরণের অগ্রদূতী। এর অভ্যর্থনা সভায় নিশ্চয়ই যাবে কিন্তু। ---আমি বললাম, 'কাজীদা যাবো নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি যাবেন আপনার কবিতার সওগাত নিয়ে, আমি কী নিয়ে যাবো?' তিনি বললেন, 'ওঃ-আচ্ছা,' তারপর কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন। কী অপূর্ব গানই না লিখে দিলেন! বললেন, 'এ গানে তুমি নিজে সুর দেবে।' গান

Dhaka University Institutional Repository

তো নিয়ে এলাম। কাজীদার গানে আমি সুর দেবো, এতবড়ো ধৃষ্টতা আমার নেই। অথচ তাঁর আদেশ। বাসায় হারমোনিয়াম নিয়ে বসলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার বাসায় এলো ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁর ছেলে মরহুম আবদুল করিম খাঁ ওরফে বালী। বললাম, 'ভাই, উদ্ধার করো-এ যে বিরাট পরীক্ষা; কাজীদার গান, আমাকে সুর দিতে বলেছেন।' বালী প্রথম স্তবকে সুর সংযোগ করলো, তারপর বললো, 'এইভাবে করতে থাকো,' পরদিন সমস্ত গানটা যখন গেয়ে শোনালাম, কাজীদা মহা খুশী। গানটা হচ্ছে: 'গুনে গরিমায় আমাদের নারী।' [২১]

এই গানে নজরুল নারীর রূপ-লাবণ্যের প্রশস্তি বর্ণনা করেন। সে সাথে ইতিহাসে নারীর গৌরবময় ভূমিকা স্মরণ করিয় দিয়েছেন।

গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়।
রূপে লাবণ্যে মাধুরী ও শ্রীতে হুরী পরী লাজ পায়।।
নর নহে, নারী ইসলাম'পরে প্রথম আনে ঈমান,
আম্মা খাদিজা জগতে সর্ব-প্রথম মুসলমান,
পুরুষের সব গৌরব ম্লান এক এই মহিমায়।।[২২]

নজরুল ইসলাম প্রথম যুগের নারী যেমন নবী-নন্দিনী ফাতেমা,বিবি রহিমার নাম স্মরণ করেছেন, তেমনি ইতিহাসখ্যাত রাজ্যশাসক বিজিয়া, বীরাঙ্গনা চাঁদ সুলতানা, জ্ঞান তাপস জেবুন্নেসা, ওহাবীর দলপতি লায়লা, সম্রাট শাহজাহানের কন্যা জাহানারা এঁদের প্রসঙ্গও এনেছেন। মুসলিম নারীদের এই গৌরবময় অতীত আজ শুধুই অতীত ইতিহাস; বর্তমান আজ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। নারী অন্দরমহলে বন্দী হয়ে প্রকারান্তরে ইসলামকেই কালিমালিপ্ত করছে। নারীরা বাইরে বেরিয়ে আসলে হালিদার মত লক্ষ হালিদার জন্ম হবে।

নারীকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। বিশেষ করে তার সমকালীন পশ্চাৎপদ মুসলিম নারী সমাজকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে তিনি তাঁদের মহিমা ও গুণগান গেয়েছেন। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত এমন একটি গান:

আমি গরবিনী মুসলিম বালা।
সংসার সাহারাতে আমি গুলে লালা।।
জ্বালায়েছি বাতি আঁধার কাবায়,
এনেছি খুশির দিনে শিরনির থালা।।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম নারীর অবদান চির স্বীকৃত।

এই অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ নজরুল লিখেছেন,

আনিয়াছি ঈমান প্রথম আমি,
দিয়াছি সবার আগে মোহাম্মদকে মালা।।
কতশত কারবালা বদরের রণে
বিলায়ে দিয়াছি স্বাক্ষী-পুত্র স্বজনে;
জানে গ্রহ-তারা জানে আল্লাহ তালা।।[২৩]

নজরুলের গানে নারী শুদ্ধ-সুন্দর-কল্যাণময়ী রূপের প্রতীক। ইতিহাস, পুরাণ থেকে প্রসঙ্গ এনে তিনি নারীর প্রেম, শক্তি, যোগ্যতা, ক্ষমতাকে মহিমান্বিত করেছেন। শুধুমাত্র নারীর মহিমা ও গুণগান করেই তিনি তাঁর সমাজসচেতন কর্তব্য সমাপ্ত করেননি। তিনি নারীকে তাঁর অধিকার আদায়ে বিদ্রোহী হওয়ারও আহবান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকে নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৩

২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৩। হুমায়ুন আজাদ,নারী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ.৩৮০,

৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১

৫। উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৪৯৬

৬। ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭

৭। ওয়াকিল আহমদ, প্রাক্তগু, পৃ. ৪৯৯

৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭

৯। রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সৃজন, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২১৩

১০। কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সৃজন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

১১। আবদুল কাদির (সম্পাদিত) নজরুল রচনাবলী ১ম খ. (বুলবুল), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮

১২। কল্পতরু সেনগুপ্ত (সম্পাদিত) নজরুলগীতি সহায়িকা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ২০৯

১৩। প্রাগুক্ত, নজরুল রচনাবলী ২য় খ. (জাতীয় সঙ্গীত, নজরুল গীতিকা), পৃ. ৮৮

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯

১৬। আবদুল কাদির (সম্পাদিত) নজরুল রচনাবলী ২য় খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

১৭। এ.কে.এম আবদুল আলিম, ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় সং, ১৯৭৩, পৃ.১৪৭

১৮। আবদুল কাদির (সম্পাদিত) নজরুল রচনাবলী ৩য় খ., বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২৬৭

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

২০। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

২১। বিশ্বনাথ দে (সম্পাদিত) নজরুল স্মৃতি, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, সাহিত্যম্, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ১৪৮

২২। নজরুল রচনাবলী ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
হিন্দু-মুসলিম জাগরণধর্মী গান

নজরুল তাঁর ইসলামী গানে প্রাণের গভীর অনুভূতিকে সহজ উদ্দীপনাময় ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ইসলামী গানের মধ্যে পড়ে আল্লাহর প্রশস্তিমূলক গান বা হামদ, হযরত মুহম্মদ (সা:) এর প্রশস্তি মূলক গান বা নাত, ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিধি-বিধান, উপাসনালয় প্রভৃতি বিষয়ক গান। আসাদুল হক তাঁর 'ইসলামী ঐতিহ্যে নজরুল সঙ্গীত' শীর্ষক গ্রন্থে ইসলামী গানের মোট সংখ্যা দেখিয়েছেন ২৮৪ টি।[১] ভক্তিভাবের অতিরিক্ত সমাজসচেতন চিন্তা-চেতনা প্রবলরূপে প্রকটিত হওয়ায় তাঁর এধরণের গান পূর্বসূরীদের গান থেকে হয়েছে স্বতন্ত্র।

তাঁর ভক্তিমূলক গান শুধু ভক্তিভাবে সীমাবদ্ধ থাকেনি, পরিণত হয়েছে জাগরণী গানে। তাঁর ধর্মীয় জাগরণধর্মী গানকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

১। মুসলিম জাগরণধর্মী গান;

২। জাত-পাত বিরোধী গান;

৩। হিন্দু-মুসলিম মিলন গান।

ইসলামী গান রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে আব্বাসউদ্দীন আহমদ বলেছেন, তাঁর বিশেষ অনুরোধে নজরুল ইসলামী গান লেখা শুরু করেন। নজরুলের প্রথম ইসলামী গানের রেকর্ড 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ' মুসলিম সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করলে তিনি উৎসাহিত হয়ে একের পর এক ইসলামী গান লিখে চলেন। গ্রামোফোন কোম্পানী ছিল পুরোপুরি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ব্যবসায়িক সাফল্যের কারণেই সে সব গানের রেকর্ড গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে বের হয়। শিল্পী আব্বাসউদ্দীন তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন, 'এর পর কাজীদা লিখে চললেন ইসলামী গান। আল্লাহ রসুলের গান পেয়ে বাংলার মুসলমানের ঘরে ঘরে জাগল এক নব উন্মাদনা। যারা গান শুনলে কানে আঙুল দিত তাদের কানে গেল 'আল্লা নামের বীজ বুনেছি'। 'নাম মোহাম্মদ বোলরে মন, নাম আহমদ বোল', কান হতে হাত ছেড়ে দিয়ে তন্ময় হয়ে শুনল এ গান, আরো শুনল: আল্লাহ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়। মোহররমে শুনল মর্সিয়া। ঈদে নতুন

Dhaka University Institutional Repository

করে শুনল, এলো আবার ঈদ ফিরে এলো আবার ঈদ, চলো ঈদগাহে। ঘরে ঘরে এলো গ্রামোফোন রেকর্ড গ্রামে গ্রামে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল আল্লা রসুলের নাম।[২]

১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নজরুল দ্বিতীয়বারের মত ঢাকায় আসেন। আসার পথে পদ্মা বক্ষে স্টিমারে বসে মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে লেখেন 'খোশ আমদেদ' বা 'আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালী' গানটি । মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন হয় ২৭ শে ফেব্রুয়ারী রোববার বেলা ১২টায় মুসলিম হল মিলনায়তনে। সভায় নজরুল 'খোশ আমদেদ ' গানটি পরিবেশন করেন।[৩]

মুসলিম সাহিত্য সমাজ গঠন ভারতের মুসলমানদের মনে নতুন আশা সঞ্চার করেছিল। নজরুল এ সংগঠনকে স্বাগতম জানিয়েছেন। এ গানে অতীতের জগদ্বিখ্যাত মুসলিম ব্যক্তি যেমন হারুন-আল-রশীদ, আল-বেরুনী, হাফিজ, খৈয়াম, কায়েস, গাজ্জালী, ফরহাদ-শিরী, লায়লি, মজনু এঁদের নাম স্মরণ করেছেন। শেষ দুই চরণে কবি আহ্বান করছেন অতীতের গৌরবে বিভোর না থেকে নবীনের আগমনকে স্বাগতম জানাতে।

বাসিফুল কুড়িয়ে মালা নাই গাঁথিলি, রে ফুল-মালি!
নবীনের আসার পথে উজার ক'রে দে ফুল ডালি।[৪]

জুলফিকার (১৯৩২) সঙ্গীত গ্রন্থটি ইসলামী গানের সংকলনগ্রন্থ। এ গ্রন্থে সংকলিত ২৪টি গানের ২১ টি গানই ইসলামী গান। গানগুলি জাগরণধর্মী। গানগুলিতে ইসলামের অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণ করা হয়েছে; সে সাথে মুসলিম সমাজ অতীতের স্বপ্নে বিভোর না থেকে বর্তমানের কঠিন বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাক এই আহ্বান কবির।

যেমন প্রথম গান 'দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে' মার্চের সুরে; কাহারবা তালে নিবদ্ধ। গানটি হচ্ছেঃ

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে
দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল।
ওরে রে খবর, তুইও ওঠ জেগে
তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল।।

Dhaka University Institutional Repository

--- --- ---

মোরা আস্‌হাব কাফেরের মত

হাজারো বছর শুধু ঘুমাই,

আমাদের কেহ ছিল বাদশাহ

কোন কালে, তারি করি বড়াই,

জাগি যদি মোরা, দুনিয়া আবার

কাঁপিবে চরণে টালমাটাল।।[৫]

জুলফিকার সঙ্গীত গ্রন্থের এধরণের আরও কয়েকটি গানের উল্লেখ করা হলোঃ

১। কোথায় তখ্‌ত তাউস

কোথায় সে বাদশাহী।

২। জাগে না সে জোস্‌ ল'য়ে আর মুসলমান

৩। ইসলামের ঐ সওদা লয়ে

এল নবীন সওদাগর।

জুলফিকার দ্বিতীয় খন্ড ১৯৩২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ গন্থের ৩০টি গানের মধ্যে ২৮টি গানই ইসলামী গান। এই গন্থের গানগুলি আল্লাহ, রসুল, ইসলামের ঐতিহ্যপূর্ণ স্থান সংক্রান্ত।

মোহররম ও কারবালার করুণ কাহিনী নিয়ে নজরুল একাধিক গান লিখেছেন।

১। মোহররমের চাঁদ এল ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়

ওয়া হোসেনা-ওয়া হোসেনা তারি মাতম শোনা যায়।।

২। খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী

বিশ্ব -দুলালী নবী-নন্দিনী

মদিনা-বাসিনী পাপ-তাপ-নাশিনী

উম্মত-তারিনী আনন্দিনী।।---

হাসান হোসেনে তব উম্মত তরে মাগো

Dhaka University Institutional Repository

কারবালা প্রান্তরে দিল বলিদান,

৩। ওগো মা ফাতেমা ছুটে আয়

তোর দুলালের বুকে হানে ছুরি।

৪। ফোরাতের পানিতে নেমে ফাতেমা দুলাল কাঁদে

এসব উদাহরণ থেকে বুঝা যায় কারবালার ঘটনা নজরুলের মনে কতটা রেখাপাত করেছিল নজরুল শুধুমাত্র অতীতের মহিমা প্রচারের জন্যই অতীতের ঘটনা নিয়ে লিখেননি। বর্তমানকে সমৃদ্ধ করতে অতীতকে লেখায় ব্যবহার করেছেন। অতীতের স্মরণীয় ঘটনাগুলো মুসলিম সমাজকে নবজাগরণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক হযরত মোহাম্মদ (সা:) কে নিয়ে তিনি অনেক গান লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি:

১। নাম মোহাম্মদ বোল রে মন নাম আহমদ বোল

সে নাম নিয়ে চাঁদ সেতারা আসমানে খায় দোল।।

২। মরু সাহারা আজি মাতোয়ারা

হলেন নাজেল তাহারি দেশে খোদার রসুল।

৩। আসিছেন হাবিবে খোদা, আরশ্‌পাকে তাই উঠেছে শোর

চাঁদ পিয়াসে ছুটে আসে আকাশ পানে যেমন চকোর।

৪। ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়

আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়।

৫। সাহারাতে ফুট্‌ল রে ফুল রঙিন গুলে লালা

অই ফুলেরই খোশ্‌বতে আজ দুনিয়া মাতোয়ালা

৬। তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহম্মদ (সা:) এর মহিমা বর্ণনা বিষয়ক গানকে নাত বলা হয়। গানগুলো রূপ, রস, সুর, ছন্দে বাঙালী মুসলমান সমাজে সমাদৃত। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাবগম্ভীর পরিবেশে এগুলো গাওয়া হয়। হযরত মুহম্মদ (সা:) এর জীবনাদর্শ, মানবিক গুনাবলী ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে আকৃষ্ট করে এবং প্রাত্যহিক জীবন চলার পথে অনুসরণ করার অনুপ্রেরণা দেয়। নাত জাতীয় গান মুসলমানদের মনের খোরাক মিটিয়ে তাদের সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহী করেছে। আসদুল হক 'ইসলামী ঐতিহ্যে নজরুল সঙ্গীত' গ্রন্থে নাত জাতীয় ১০৮টি গানের তালিকা সংযোজন করেছেন।[৬]

হামদে আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করা হয়। এ ধরণের গান রচনায় নজরুলের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর হামদগুলো অলঙ্কারযুক্ত এবং ভাবসমৃদ্ধ। সাবলীল ভাষা ও সুরের প্রয়োগে গানগুলি মনকে আলোড়িত করে। পূর্ববর্তী গীত রচনা থেকে এসকল গানের স্বাতন্ত্র্য সহজেই চোখে পড়ে। বিশেষ করে যে সকল হামদ জাগরণধর্মী এগুলোর কোন পূর্বসূরী নেই। বিষয়, শব্দচয়নে এ গানগুলো একেবারেই নতুন। আসাদুল হক 'ইসলামী ঐতিহ্যে নজরুল সঙ্গীত' গ্রন্থে ১৪১টি হামদ গানের তালিকা দিয়েছেন।[৭]

১। রোজ হাশরে আল্লাহ আমার করো না বিচার

২। খোদা এই গবীবের শোনো শোনো মোনাজাত

৩। শোন শোন য়্যা এলাহী

৪। আল্লাহ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়।

৫। তোমারই প্রকাশ মহান এ নিখিল দুনিয়া জাহান।

মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতা কাটাতে নজরুলের ইসলামী গান অভূতপূর্ব সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। নজরুলের পূর্বে বহু শতাব্দীব্যাপী ইসলামী গানের ক্ষেত্রে এক ধরণের শূন্যতা বিরাজ করছিল। কিছু ভক্তিমূলক ইসলামী গান তখন রচিত হয়েছিল যা আজ লুপ্তপ্রায়।

মধ্যযুগের পুঁথি সাহিত্য, লোক সাহিত্য, বাউল ও ফকিরদের গানে ইসলামী গানের পরিচয় পাওয়া যায়। দু'একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা হল:

Dhaka University Institutional Repository

১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ সুলতান নবীবংশ রচনা করেন।[৮] উদ্দেশ্য ছিল দেশজ মুসলিম সমাজকে ইসলামী ইতিকথায় ও ঐতিহ্যে দীক্ষা দেওয়া । কবির ভাষ্যঃ

হেনকালে অনাদি নিধান করতারে
আদেশ করিল সব ফিরিস্তা সভারে।
পৃথিবীতে মৃত্যু হইছে যথ নরগণ
আজি রাতি সে সভারে না করউক তাড়ন।[৯]

|নবী বংশ, ২য় খন্ড: সৈয়দ সুলতান|

১৭১২ সালে শেখ সাদী গদা-মালিকা সম্বাদ রচনা করনে। [১০]

এর কিছু অংশ নিম্নরূপ:

আগাছে আল্লাহর নাম মনে করি সার
আঠার হাজার আলম সৃজন যাহার।
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার
অদ্ভুত বিভুত প্রভু নিরূপ আকার।[১১]

|গদা-মালিকা সম্বাদ: শেখ সাদী|

উনিশ শতকে বাউল দুদ্দু শাহ রচিত একটি গান-

আমি এমন জনম পাব কি রে আর
এমন চাঁদের বাজার মিল্‌বে কি আবার।।
এমন আনন্দ রসে
আর কি গো যাবো ভেসে
মানব জন্ম পাবো, দেহের কামনা অপার।।
এহেন জনম পেয়ে
কাল কাটালাম ঘুমাইয়ে
জনম গেল রে বয়ে, গেল আমার।।
পরের গোয়ালে ধূঁয়া
কাটালাম পথে কত কুয়া
দীন দুদ্দু কয় দোহাই দিয়া, সাঁই যা কর এবার।।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

এ সকল গানের সাথে তুলনা করলে নজরুলের মুসলিম জাগরণধর্মী গানের স্বাতন্ত্র্য সহজেই চোখে পড়ে। নজরুলের গান বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, শব্দচয়নের পটুত্ব, সুরের কোমলতা ইত্যাদি গুনের কারণে জনপ্রিয়তা পেয়েছে; কিন্তু এই গুণগুলোকে ছাপিয়ে আর একটি বিশেষ গুণ তাঁর গানকে পূর্বসুরীদের গান থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় আসীন করেছে। সেটি হচ্ছে তাঁর গানের সমাজ-ভাবনা। ইসলাম ধর্মের সাম্য, মৈত্রী, গণতন্ত্র, ভাতৃত্ববোধের আদর্শ ইসলামী গানের বৈশিষ্ট্য। ভক্তিভাবকে অতিক্রম করে নজরুলের ইসলামী গান সমাজসচেতন জাগরণী গানে পরিণত হয়েছে।

জাত-পাত বিরোধী গান: অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী কবি নজরুলের একটি বহুল প্রচারিত গান 'জাতের বজ্জাতি'। ২০শে জুলাই, ১৯২৩ তারিখে এই কবিতাটি 'জাত জালিয়াৎ' শিরোনাম দিয়ে সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৩] মুজফ্ফর আহমদ তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা' গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণে লিখেছিলেন, 'জাতের নামে বজ্জাতি' বা 'জাতি জালিয়াৎ' কবিতাটি নজরুল নলিনাক্ষ সান্যালের বিয়ের অনুষ্ঠানে একটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে রচনা করেছিলেন। মুজফ্ফর আহমদ জানিয়েছেন,

"১৩৩১ সালের ৩রা বৈশাখ তারিখে (১৭ই বা ১৮ই এপ্রিল, ১৯২৪) রহরমপুরে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। কবির সাহিত্য ও সঙ্গীতের বন্ধু উমাপদ ভট্টাচার্যের কাকার বাড়ি ছিল ডক্টর সান্যালের শ্বশুরবাড়ি। পরিবেশটি ছিল অত্যন্ত গেঁড়ো হিন্দুয়ানী। সামাজিক ক্রিয়ার এ-বাড়ির নিমন্ত্রণে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের আলাদা আলাদা পংক্তিতে খেতে বসতে হতো। মুসলমানদের তো তার ত্রিসীমায়ও ঢোকার কথা নয়। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে ডক্টর সান্যালের শর্ত ছিল এই যে, জাতিভেদ মেনে তাঁর নিমন্ত্রিতদের অপমান করা চলবে না। অমনিতে সঙ্গীতচর্চার জন্যে নজরুল ইসলাম উমাপদ ভট্টাচার্যের বাড়িতে যেত। কিন্তু সেদিন সে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে ডক্টর সান্যালের বিবাহ আসরে উপস্থিত হলো। কয়েদী নজরুলের বহরমপুর জেলের সুপারিন্টেডেন্ট ও মুরশিদাবাদের সিভিল সার্জন পৈতাধীরা কায়স্থ নেতা ডাক্তার বসন্তকুমার ভৌমিকও এই আসরে উপস্থিত ছিলেন। বরযাত্রীরা সমবেত নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে বসতে যাচ্ছেন দেখতে পেয়ে গোঁড়ার দল উঠে গেলেন। তখন নজরুল ইসলাম উমাপদ ভট্টাচার্যের বাড়িতে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আবার ফিরে এলো। তার হাতে ছিল কাগজে লেখা 'জাতের নামে বজ্জাতি' বা 'জাত জালিয়াৎ' কবিতাটি। তাতে যে সুরও সংযোজন করেছিল। এই কবিতাই সে বিবাহ-আসরে গেয়ে শুনিয়ে দিল। ডক্টর সান্যাল তো ভেবেছিলেনই, সেখানে উপস্থিত আরও অনেকে ভেবেছিলেন সে কাবিতাটি তখনই নজরুল রচনা করে নিয়ে এসেছিল। অবস্থার সঙ্গে অদ্ভুত খাপ খেয়ে গিয়েছিল কবিতাটি। ডক্টর সান্যালের কোন দোষ দেওয়া যায় না। আসলে স্মৃতি হতে কবিতাটি তখন নজরুল কাগজে লিখে নিয়েছিল।"[১৪] গানটির প্রথমাংশ উদ্ধৃত করা হলঃ

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া।।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাব্‌লি এতেই জাতির জান,
তাই ত বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে এক শ'-খান!
এখন দেখিস্ ভারত-জোড়া
প'চে আছিস বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া।।[১৫]

হিন্দুসমাজে প্রচলিত বর্ণভেদ প্রথাকে তিনি তীব্র ব্যঙ্গের কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজে বিদ্যমান ছুৎমার্গ নজরুলের চোখে অমানবিক এবং জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে গণ্য। নজরুল সমাজের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন:

বল্‌তে পারিস্ বিশ্ব-পিতা ভগবানের কোন সে জাত?
কোন্ ছেলের তাঁর লাগলে ছোঁওয়া অশুটি হন জগন্নাথ?
নারায়ণের জাত যদি নাই,
তোদের কেন জাতের বালাই?
(তোরা) ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মা'র মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া।।[১৬]

কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া ব্রাহ্মণরা জাত বাঁচাতে এতটাই সতর্ক থাকতেন যে এসম্পর্কিত একটি চমকপ্রদ বর্ণনা 'নজরুল কাব্যে রাজনীতি' গ্রন্থের লেখক আমীর হোসেন দিয়েছেন। লেখকের বর্ণনা এরকম-

Dhaka University Institutional Repository

"মাদ্রাজ প্রদেশে নাকি এমনও দেখা যাইত যে কুলীন ব্রাহ্মণদের ছায়া স্পর্শ করাও অব্রাহ্মণদের জন্য একেবারে নিষিদ্ধ ছিল; এই কারণে কুলীন ব্রাহ্মণগণ পথ চলার সময়ে তালি বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইত, যাহাতে অবর্ণ হিন্দুগণ পথের দুপাশে সরিয়া দাঁড়ায় এবং ঐ কুলীন ব্রাহ্মন পুঙ্গব অস্পৃশ্যদের ছায়া না মাড়াইয়া নির্বিঘ্নে অগ্রসর হইতে পারে"। [১৭]

হিন্দুসমাজের প্রচলিত জাতিভেদ প্রথাকে নজরুল মনুষ্যত্বের অবমাননা বলে মনে করতেন। মনুষ্যসৃষ্ট পুঁথিগত ধ্যান-ধারণাকে অস্বীকার করে জগৎ-পিতার সৃষ্ট বিধান সাম্য লোক প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার পরিচায়ক। 'বিষের বাঁশী' গ্রন্থের অন্তর্গত সত্য-মন্ত্র শীর্ষক গানটি জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে কবির তীব্র প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ।

পুঁথির বিধান যাক্ পুড়ে তোর,
বিধির বিধান সত্য হোক!
--- --- ---
জাতের চেয়ে মানুষ সত্য,
অধিক সত্য প্রাণের টন
প্রাণ ঘরে সব এক সমান।
বিশ্ব-পিতা সিংহ-আসন
প্রাণ বেদীতেই অধিষ্ঠান,
আত্মার আসন তাই ত প্রাণ।
জাত-সমাজের নাই সেথা ঠাঁই,
জগন্নাথের সাম্য-লোক!
জগন্নাথের তীর্থ লোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!
বিধির বিধান সত্য হোকভ। [১৮]

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু-মুসলিম মিলন গানঃ

নজরুলের সমাজভাবনায় সাম্প্রাদায়িকতার কোন স্থান ছিল না। আজীবন অসাম্প্রাদায়িক চেতনাকে তিনি লালন করেছেন। তাঁর শৈশবের লেখায় হিন্দু-মুসলিম এই উভয় সম্প্রদায়ের সমান উপস্থিতি লক্ষ্য করি। পরিণত বয়সেও এই ধারা অব্যাহত ছিল এবং এই দুই সম্প্রদায়ের সহাবস্থান কামনা করে তিনি অনেক গান লিখেছেন। দেশ ও সমাজের উন্নতির জন্য এই মিলন প্রচেষ্টা জরুরী ছিল। তাঁর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক কয়েকটি গান হচ্ছে:

১। মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান

২। হিন্দু-মুসলমান দুটি ভাই

৩। ভাই হ'য়ে ভাই চিন্‌বি আবার গাইব কি আর এমন গান।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। আসাদুল হক, ইসলামী ঐতিহ্যে নজরুল সঙ্গীত, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, জানুয়ারী ২০০০, পৃ. ৭৯

২। আব্বাসউদ্দীন আহমদ, আমার শিল্পী জীবনের কথা, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৬০, পৃ. ৫৪

৩। রফিকুল ইসলাম, নজরুল প্রসঙ্গে, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১১৪

৪। আবদুল কাদির (সম্পাদিত) নজরুল রচনাবলী ১ম খ. (খোশ আমদেদ, জিঞ্জীর) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ.৪৪৫

৫। আবদুল কাদির (সম্পাদিত) নজরুল রচনাবলী ২য় খ. (জুলফিকার) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ.২১৯

৬। ইসলামী ঐতিহ্যে নজরুল সঙ্গীত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৮। আহমদ শরীফ (সম্পাদিত) সৈয়দ সুলতান বিরচিত নবীবংশ ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ১৯৯

৯। সৈয়দ সুলতান বিরচিত নবীবংশ ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

১০। আহমদ শরীফ (সম্পাদিত) সওয়াল সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৮৩, পৃ. ১৮

১১। সওয়াল সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

১২। আহমদ শরীফ (সম্পাদিত) মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৬৯. পৃ. ৪৩০

১৩। কল্পতরু সেনগুপ্ত, নজরুলগীতি সহায়িকা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমী, কলকাতা, ১৯৯৭. পৃ. ২১১

১৪। মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৮৮

১৫। আবদুল কাদির (সম্পাদিত) নজরুল রচনাবলী ১ম খ. (জাতের বজ্জাতি, বিশের বাঁশি) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১১৬

১৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

১৭। আমীর হোসেন চৌধুরী, নজরুল কাব্যে রাজনীতি, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৮. পৃ,. ২৭

১৮। নজরুল রচনাবলী ১ম খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
দেশপ্রেমমূলক গান

বাংলা স্বদেশসংগীত রচনার সূচনাপর্ব থেকেই অজস্র দেশপ্রেমমূলক গান রচিত হয়ে আসছে । ঈশ্বরগুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) স্বদেশ বিষয়ক কবিতার গভীর দেশপ্রেমের প্রেরণাই পরবর্তীতে তাঁর ভাবশিষ্যদের দেশাত্মবোধক সংগীত রচনায় উৎসাহিত করেছে।[১] প্রাক বঙ্গভঙ্গ যুগে এই ধারার বিশিষ্ট গান হল বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ গানটি। বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী যুগে এই ধারার বিশিষ্ট গীতিকার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ। দেশাত্মবোধের সঙ্গে বিশ্ববোধের সম্মিলন ঘটিয়ে গানে এক নতুন মাত্রা আনেন রবীন্দ্রনাথ। নজরুলের দেশবন্দনামূলক গানগুলি এই প্রচলিত ধারায় রচিত। এ পর্যায়ের গানে কবির দেশপ্রেমের অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তাঁর এধরণের গানে রয়েছে স্বদেশের অতীত ঐতিহ্যের কথা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চিত্র, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য প্রভৃতি বিষয়। জন্মভূমির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা অথবা দেশের প্রতি অপূরণীয় ঋণ স্বীকার প্রভৃতি উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে এসকল গানে। গানগুলির ভাবের ঐশ্বর্য, সুরের কোমলতা সহজেই হৃদয়কে স্পর্শ করে।

'সুর-সাকী' (প্রকাশকাল: ১৯৩১) সঙ্গীতগ্রন্থে দেশপ্রেমমূলক সাতটি গান রয়েছে। 'সুর-সাকী'র এই গানটিতে বাংলা মায়ের রূপ অপূর্ব মাধুর্য ও সৌন্দর্যের সমন্বয়ে চিত্রিত হয়েছে। গানটি অতুলনীয়-

আমার শ্যামলা বরণ বাঙলা মায়ের
রূপ দেখে যা, আয়রে আয়।
গিরি দরী-বনে-মাঠে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়।।
ধানের ক্ষেতে বানে ফাঁকে
দেখে যা মোর কালো মা'কে
ধূলি-রাঙা পথের বাঁকে বৈরাগিনী বীণ্ রাজায়।। ২

এই গ্রন্থের অপর দু'টি গান 'আমার সোনার হিন্দুস্থান' ও 'উদার ভারত সকল মানবে দিয়াছ তোমার কোলে স্থান 'গান দু'টি দেশগৌরব বিষয়ক। স্বদেশকে এখানে সকল দেশের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছে। যেমন-

আমার সোনার হিন্দুস্থান।
দেশ-দেশ-নন্দিতা তুমি বিশ্বের প্রাণ।।

Dhaka University Institutional Repository

ধরণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা তুমি আদি মাতা,
তব পুত্র গাহিল বেদ-বেদান্ত সাম-গাথা,
তব কোলে বারেবারে এল ভগবান।।

ভারতবর্ষে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের সহাবস্থান একে তীর্থস্থানে পরিণত করেছে। কবির ভাষ্য-

উদার ভারত! সকল মানবে
দিয়াছ তোমার কোলে স্থান।
পার্সী জৈন বৌদ্ধ হিন্দু
খৃষ্টান শিখ মুসলমান।।

তুমি পারাবার, তোমাতে আসিয়া
মিলেছে সকল ধর্ম-জাতি ,
আপনি সহিয়া ত্যাগের বেদনা
সকল দেশের করেছে জ্ঞাতি;
নিজেরে নি:স্ব করিয়া, হয়েছ
বিশ্ব মানব পীঠস্থান।। [৩]

'লক্ষ্মী মা তুই আয় গো উঠে সাগর জলে সিনান করি' 'সুর-সাকী'র এই গানে কবি লক্ষ্মীর প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশা করছেন । গানটির শেষ ক'টি পঙ্‌ক্তি অনবদ্য।

কোন দু:খে তুই রইলি ভুলে বাপের বাড়ী অতল-তলে,
ব্যথার সিন্ধু মন্থন শেষ, ভরল যে দেশ হলাহলে,
অমৃত এনে সন্তানে বাঁচা, মা তোর পায়ে ধরি।। [৪]

'বন-গীতির'র (১৯৩২) অন্তর্গত' নম:নম: নমো বাঙলা দেশ মম' শীর্ষক গানটিতে দেশভক্তির গভীরতা হৃদয় স্পর্শ করে। ষড় ঋতুর রূপ বৈচিত্র্যের দৃশ্য দেশের নিসর্গ শোভার বর্ণনাকে বর্ণিল করেছে।

'গুলবাগিচা'র (১৯৩৩) অন্তর্গত দু'টি গান দেশগৌরব ও জন্মধন্যতা বিষয়ক। একটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হলো-

Dhaka University Institutional Repository

আমার দেশের মাটি

ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি ।।

এই দেশেরই মাটি জলে

এই দেশেরই ফুলে ফলে

তৃষ্ণা মিটাই মিটাই ক্ষুধা

পিয়ে এরি দুধের বাটি ।। [৫]

এই গ্রন্থের 'স্বপ্নে দেখেছি ভারত-জননী'ও একই ধরণের গান। এই গানে কবি সুখী-সমৃদ্ধশালী, ঈর্ষা-দ্বেষহীন নবীন ভারতের প্রত্যাশা করেন।

'গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ঐ' গানটি অতীত ঐতিহ্যের স্তবগান বিষয়ক। কবি অতীতের গৌরবোজ্জ্বল দিনকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বর্তমান দুরবস্থা থেকে উত্তরণের আশায় ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন।

'স্বদেশ আমার! জানি না তোমার/শুধিব মা কবে ঋণ' শীর্ষক গানটিতে দেশের প্রতি ঋণ স্বীকার এবং ঋণ পরিশোধের অদম্য স্পৃহা প্রকাশ পেয়েছে। দেশের বর্তমান দুরবস্থার জন্য দেশ যেমন অভাগিনী, সন্তান হিসেবে কবিও নিজেকে সমান ভাগ্যহীন মনে করেন। দেশকে ভালবাসা মানে শুধু এর ভৌগোলিক পরিবেশ যেমন পাহাড়, মাটি, বায়ু, জলকে ভালবাসা নয়; এর মানুষকেও ভালাবাসতে হবে। ক্ষুদ্র ম্লেচ্ছ কাঙাল মানুষকে ভালাবাসালেই দু:খী দেশমাতার দু:খ দূর হবে।

'সুর-লিপি'র (১৯৩৪) অন্তর্গত ' ভারত-লক্ষ্মী আয় মা ফিরে এ ভারতে' শীর্ষক গানটি বর্তমান দুরবস্থার জন্য আক্ষেপ করে লেখা। কবি মায়ের প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে দেশ স্বাধীন হবে এমন প্রত্যাশা করেন।

'গানের মালা'র (১৯৩৪) দু'টি গান দেশবন্দনামূলক। 'জননী মোর জন্মভূমি, তোমার পায়ে নোয়াই মাথা' গানটি অসাধারণ হৃদয়স্পর্শী। অকুণ্ঠ চিত্তে দেশের গৌরব গাঁথা বর্ণনা এবং দেশের প্রতি ঋণস্বীকার, বর্তমান দুরবস্থার জন্য আক্ষেপ করা ইত্যাদি এ-গানের উপজীব্য বিষয়। 'একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী' গানটিতে কবি ষড় ঋতুতে গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্যের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য চিত্রিত করেছেন। গানটি রাগ: বেহাগ মিশ্র; কাওয়ালী তালে রচিত। বাউল, কীর্তন ও ভাটিয়ালী সুরের প্রয়োগ হয়েছে। গানের শেষ অংশে 'ভাটিয়ালী গাও

Dhaka University Institutional Repository

মাঝিদের সাথে, কীর্তন শোনো রাতে মা' চরণদ্বয়ের প্রথমে ভাটিয়ালী ও দ্বিতীয়টিতে কীর্তনাঙ্গ সুরের প্রয়োগ ভাষার ব্যঞ্জনা বৃদ্ধি করেছে।[৬] এখানে খাঁটি বাঙালী সংস্কৃতির পরিচয় রয়েছে।

এছাড়া গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কিছু দেশপ্রেমমূলক গান রয়েছে। যেমন- 'কল কল্লোল ত্রিংশ কোটি কণ্ঠে উঠেছে গান' এটি দেশপ্রেম ও প্রাকৃতিক রূপ বৈচিত্র্যের প্রশস্তিমূলক গান। 'এ ভারতে নাই যাহা, তা ভূ-ভারতে নাই' শীর্ষক গানের প্রথম অংশে দেশের ভূ-প্রকৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের কথা বলা হয়েছে। এর পরের অংশে দেশে এ বিত্ত বৈভব থাকার সত্ত্বেও দেশ-জননীর দৈন্য দশার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে । যেমন-

পাঁচ ভূতে খায় লুটে রে-ভাই আমার দেশের দান,
(তবু) কম হল না কভু ইহার বিভব অফুরান।
মানুষ শুধু নাই এ দেশে
নইলে কি ভাই এ দীন বেশে
কেঁদে বেড়ায় দেশ-জননী অঙ্গে মেখে ছাই
মোরা অবহেলে এই অফুরান বিভব যে হারাই।।[৭]

'ভারত আজিও ভোলেনি বিরাট/মহাভারতের গান' শীর্ষক গানটি অতীত ঐতিহ্য স্মরণ করে লেখা। অতীতকে স্মরণ করে ভারতে নব অনুরাগে বিরাট চেতনা সৃষ্টি হয়েছে। নিদ্রোত্থিত ভারতবর্ষ অলৌকিক শক্তি অর্জন করেছে।

নজরুলের দেশপ্রেমের গান নিছক নিসর্গ শোভার বর্ণনা কিংবা আবেগে সীমাবদ্ধ থাকেনি। দেশবাসীর স্বাধীনতার স্পৃহা, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি অনবদ্য ভাষা ও সুরের সম্মিলনে বাঙময় হয়ে ফুটে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। করুণাময় গোস্বামী, বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২৩৬

২। আবদুল কাদির (সম্পাদিত) নজরুল রচনাবলী, ২য় খ., বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৯৪

৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

৫। প্রাগুক্ত, পৃ, ৩২২

৬। করুণাময় গোস্বামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

৭। প্রাগুক্ত, নজরুল রচনাবলী, ৩য় খ., পৃ. ৭৩৪

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
স্বাধীনতা ও রাজনীতি বিষয়ক গান

কাজী নজরুল ইসলামের স্বাধীনতা ও রাজনীতি বিষয়ক গানগুলি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করে। জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রামী মনোভাব এসব গানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এধরণের গানগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়-

১। জাগরণমূলক গান

২। রাজনীতি বিষয়ক গান

৩। ব্যক্তি বিষয়ক গান

৪। রাজনৈতিক ব্যঙ্গ গান

জাগরণমূলক গানঃ জনজাগরণ, বিশেষভাবে যুব সমাজের জাগরণের উদ্দেশ্যে লেখা উদ্দীপনামূলক গানগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। করাচী ব্যারাকে থাকাকালীন পাশ্চাত্য মিলিটারী ব্যান্ডের সুর ও ছন্দে কবি তাঁর দেশাত্মবোধক মার্চ সংগীত রচনা করেন। বলাবাহুল্য এই সুর ও ছন্দ প্রযুক্ত না হলে এই পর্যায়ের গানের ওজোগুণ ও উদ্দীপনাশক্তি এমন জীবন্ত হত না। এসকল গানের ভাব, ভাষা, সুর ও ছন্দ এমনভাবে মিশে গেছে যে এগুলো কখনোই বিদেশী সুর ও ছন্দের অনুকরণজাত বলে মনে হয় না। বরং রচনাশৈলী, রসবিচার এসব দিক দিক থেকেই এগুলো সার্থক বাংলা গান হয়েছে।

বাংলা ভাষায় সামরিক পদ্ধতিতে মার্চ সংগীত নজরুল প্রথম প্রবর্তন করেন। অভিযাত্রীর পদছন্দে সে সংগীত অনবদ্য।

চল্ চল্ চল্ !

উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল

নিবে উতলা ধরণী-তল,

অরুণ প্রাতের তরুণ দল'- ১

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের গানে জাগরণী চেতনা প্রতিফলনের কারণে বাংলার বিপ্লবীরা তাঁকে আদর্শের উদগাতারূপে আপন করে নেয়। 'ধূমকেতু' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নজরুলের আবির্ভাব হয় বিপ্লববাদের চারণ কবির ভূমিকায়।[২] কবির কয়েকটি বিখ্যাত মার্চ গানের উল্লেখ এখানে করা হলো।

১। চল্ চল্ চল্ উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল

২। অগ্রপথিক হে সেনাবদল

৩। বীরদল আগে চল

৪। টলমল টলমল পদভরে, বীরদল চলে সমরে

৫। আমরা শক্তি আমরা বল আমরা ছাত্রদল

৬। জাগ দুস্তর পথের নবযাত্রী

৭। দুরন্ত দুর্মদ প্রাণ অফুরান

৮। দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে

৯। শঙ্কাশূণ্য লক্ষ কণ্ঠে বাজিছে শঙ্খ ওই

১০। চলরে চপল তরুণ দল বাঁধন হারা

রাজনীতি বিষয়ক গানঃ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে নজরুল এই শ্রেণীর গান লিখেছেন। স্বরচিত গান নিজেই সুর করে রাস্তায় মিছিলে, মিটিংএ, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এমন কি; যখন জেলে ছিলেন, তখনও অন্যান্য বন্দীদের সাথে নিয়ে গান গেয়েছেন। এধরনের একটি রচনা 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) কাব্যের প্রথম কবিতা প্রলয়োল্লাস; যা গান হিসেবেও পরিচিত।

নজরুলের প্রলয়োল্লাস কবিতা ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাংলা ১৩২৯ সালে বৈশাখ মাসে নববর্ষের সময়ে কুমিল্লায় রচিত। কবিতাটি প্রবাসী পত্রিকায় ঐ বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয়।[৩] কমরেড মুজফ্ফর আহমদের মতে, তিনি ১৯২১ সালের শেষের দিকে ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার পরিকল্পনা নিলে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে নজরুল লেখেন 'প্রলয়োল্লাস।' ১৯২২ সালে নজরুল যখন 'প্রলয়োল্লাস' লেখেন তখন খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। এ সময় কবি যে নূতনের জয়গান করেন। তা অসহযোগ আন্দোলন কাজীদের

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্যে নয়। তাঁর সিন্ধু পারের 'আগল ভাঙা' মানে রুশ বিপ্লব। আর প্রলয় মানে 'বিপ্লব', জগৎ জোড়া বিপ্লবের ভিতর দিয়েই আসছে নজরুলের নূতন অর্থাৎ এ দেশের বিপ্লব। এই বিপ্লব অন্য অর্থে আবার সামাজিক বিপ্লবও। [৪]

'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় ঝড় প্রতীকটি বারবার এসেছে। ঝড়ের রূপকে নজরুল সংগ্রাম, পরিবর্তন, পুরাতনের বিলোপ, নতুনের আবাহন রূপে চিত্রিত করেছেন। কালবৈশাখী ঝড় এবং প্রলয়ের উন্মাদনাকে বিভিন্ন পৌরাণিক প্রতীকের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের রূপক হিসেবে ব্যবহৃত করেছেন।

প্রতিটি স্তবকে 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর!' 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!' আহ্বান কবিতায় একটি আলাদা ধ্বনিঝংকার সৃষ্টি করেছে। যেমন প্রথম স্তবকে রয়েছে-

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর ।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!! [৫]

দ্বিতীয় স্তবকের পংক্তি-

আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য পাগল,
সিন্ধু পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল। [৬]

-এ চিত্র কাবৈশাখী ঝড়ের হলেও এ ঝড় রূপক অর্থে কবির আকাঙ্ক্ষিত বিপ্লবের আগমন বার্তা ঘোষণা করছে।

তৃতীয় স্তবকে প্রকৃতির ক্ষুব্ধ অশান্ত রূপের চিত্র প্রতিফলিত।

ঝামর তাহার কেশের দোলায় ঝাপটা মেরে গগন দুলায়,
সর্বনাশী জ্বালা-মুখী ধূমকেতু তার চামর দুলায়।৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ স্তবকে প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর রুপ পরিবর্তিত হয়েছে নূতন সম্ভাবনায়

এবার মহা -নিশার শেষে
আসবে ঊষা অরূণ হেসে
করুণ বেশে। [৮]

পঞ্চম স্তবকে প্রলয়ের ভয়ঙ্খর রূপের কারণে ঝড়, বজ্র, বিদ্যুতাহত আকাশকে মনে হয়েছে তীব্র গতির অশ্ব, যার ক্ষুরের দাপটে উল্কা ছুটে চলেছে। এই দৃশ্যের বর্ণনা সৃষ্টি করেছে একটি অভিনব ধ্বনিরূপময় চিত্রকল্প।

ঐ সে মহাকাল সারথি রক্ত-তড়িৎ চাবুক হানে,
রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড় তুফানে!
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে!
গগন তলের নীল খিলানে! [৯]

ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তবকে এই ধ্বংসযজ্ঞে ভীত না হয়ে সে ধ্বাংসকেই অসুন্দর অকল্যাণের বিনাশকারী হিসেবে চিরসুন্দররূপে মেনে নেওয়ার আহ্বান রয়েছে।

হুগলী জেলে থাকাকালীন নজরুল অন্যসব বন্দীদের সাথে নিয়ে 'ভাঙার গান' শীর্ষক গানটি গাইতেন। তাই অনেকের ধারণা হুগলী জেলে থাকাকালীন এই গানটি রচিত হয়েছে। এটি সঠিক নয়। মুজফ্ফর আহমদের মতে, নজরুল হুগলী জেলে ছিলেন ১৯২৩ সালে। এর প্রায় এক বৎসর পূর্বেই 'বাঙ্গলার কথা' পত্রিকায় ১৯২২ সালের ২০শে জানুয়ারী 'ভাঙার গান' ছাপা হয়েছিল।[৯] ১৯২১ সালে 'বাঙ্গলার কথা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়। তার সম্পাদক ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, আর সহকারী সম্পাদক হেমন্তকুমার সরকার, ১৯২১ সালে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে চিত্তরঞ্জন গ্রেফতার হয়ে জেলে গেলে তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। এ সময় তিনি 'বাঙ্গলার কথা'য় ছাপানোর উদ্দেশ্যে দাশ পরিবারের সুকুমার রঞ্জন দাশকে নজরুলের নিকট একটি কবিতার জন্য পাঠান। মুজফ্ফর আহমদ স্মৃতি কথায় বলেছেন, সুকুমার রঞ্জন কবিতার জন্য ৩/৪ সি, তালতলা লেনের বাসায় এসেছিলেন, না ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে এসেছিলেন তা এখন আর তাঁর মনে নেই। তবে সে সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সুকুমার

Dhaka University Institutional Repository

রঞ্জন আর তিনি বসে খুব আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। কাছেই বসে নজরুল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কবিতা লিখছিলেন। কিছুক্ষণ পর কবিতা লেখা শেষ হলে নজরুল তা দুজনকে পড়ে শোনান। এই কবিতাটি ছিল নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'ভাঙার গান'। যেহেতু ১৯২২ সালের ২০শে জানুয়ারী তারিখে 'ভাঙার গান' বাঙ্গলার কথায় ছাপা হয়েছিল; ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বরের পরে এবং ১৯২২ সালের ২০শে জানুয়ারী তারিখের আগে কোনও একদিন 'ভাঙার গান' রচিত হয়েছিল। [১১]

'ভাঙার গান' শীর্ষক গানটি নজরুলের সংগ্রামী গানের মধ্যে নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এ গানে শব্দ ও ছন্দ ব্যবহার কৌশলের মাধ্যমে বীররসাত্মক বাণী ও সুরের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে। কবির বজ্রসম উচ্চারণ-

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্তজমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ! [১২]

466984

করুণাময় গোস্বামী 'ভাঙার গান' সম্পর্কে গোপাল হালদারের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। "গোপাল হালদার এই গানটিকে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম মহান সংগীতরূপে উল্লেখ করেছেন (Gopal Haldar Kazi Nazrul Islam , New Delhi: Sahitya Academy, First Published 1973, Page 30) তিনি বলেছেন যে পুরানো স্বদেশী গীতসমূহের চেয়ে এই গানটি ছিল অনেক বেশী বীররসদৃপ্ত এবং পরবর্তীকালে এ ধরণের যত গান রচনা করেছেন কবি ভাঙার গান তাদের পূর্বসূরী। [১৩]

১৭ই জুন ১৯২১ইং তারিখে দৌলতপুর গ্রামে নার্গিসের সাথে নজরুলের বিয়ের অনুষ্ঠানে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কারণে সে দিন রাতে বিয়ের অনুষ্ঠান স্থল ত্যাগ করে নজরুল কুমিল্লার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পরদিন সকালে কুমিল্লায় ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় এসে পৌছান। কমরেড মুজফ্ফর আহমদের মতে সেই তারিখটা ছিল ৪ঠা আষাঢ় (১৩২৮ বঙ্গাব্দ)। খ্রিস্টীয় মাসের হিসাবে সেটা ছিল সম্ভবত: ১৮ ই জুন ১৯২১। সতের দিন তিনি কুমিল্লায় অবস্থান করেন। সে

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সময় অজস্র কবিতা, গান তিনি লেখেছেন। সে সময় তাঁর লেখা গানগুলির মধ্যে পাগল পথিক, মরণ-বরণ, বন্দী-বন্দনা এই গান তিনটিও ছিল। [১৪]

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে মহাত্মা গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে নজরুলের লেখা প্রথম গানটি ছিল 'এ কোন পাগল পথিক ছুটে এল বন্দিনী মার আঙিনায়। গানটি রচনা প্রসঙ্গে কমরেড মুজফফর আহম্মেদ বলেছেন, "১৯২১ সালের বিরাট অসহযোগ আন্দোলন তখন চলছিল। তারই জন্যে এই গানটি লেখার অনুরোধ নজরুলকে করা হয়েছিল। সে শুধু গানটি যে লিখেছিল তা নয়, মিছিলে ও মিটিং-এ গানটি সে গেয়েও ছিল। আমি যতটা মনে করতে পারছি, গান্ধীকে লক্ষ্য করে এটাই ছিল নজরুলের লেখা প্রথম গান। খানিকটা গান্ধীজীবাদও এই গানের ভিতরে আছে । যেমন "মুক্তি সে ত নিজের প্রাণে, নাই ভিখারীর প্রার্থনায়"। --- এই গানটির সুর কিন্তু লোকের প্রাণে পৌঁছেছিল। ৭ই জুলাই (১৯২১) তারিখে রথযাত্রার সময়ে নজরুল আর আমি যখন শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তদের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে রথ দেখাতে রাস্তায় বা'র হয়েছিলেম তখন নজরুলকে দেখিয়ে একটি ছোট ছেলে আর একটি ছোট ছেলেকে বলেছিল, "দেখ, ওই পাগল পথিক যাচ্ছে"। [১৫]

১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে নজরুল দ্বিতীয় বারের মত কুমিল্লায় যান। সে সময় ইংল্যান্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমন উপলক্ষে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ২১শে নভেম্বর কংগ্রেস দেশব্যাপী হরতাল ঘোষণা করে। কুমিল্লায়ও হরতাল উপলক্ষে প্রতিবাদ মিছিল হয়। নজরুল এ উপলক্ষে জাগরণী শীর্ষক কোরাসটি রচনা করেন। তিনি মিছিলে যোগ দিয়ে কাঁধে হারমোনিয়াম বেঁধে সারা শহর গানটি গেয়ে বেড়ান। [১৬]

ভিক্ষা দাও ! ভিক্ষা দাও!
ফিরে চাও। ওগো পুরবাসী
সন্তান দ্বারে উপবাসী
কার তবে জ্বালো উৎসব-দীপ,দীপ নেভাও! [১৭]

Dhaka University Institutional Repository

মরণ-বরণ গানে কবি মরণকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন। মরণের ভয়ে ভীত হয়ে ঘরে আবদ্ধ না থেকে সকলকে পথে নামার আহবান করছেন। সকল অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে, প্রয়োজনে হাতে অস্ত্র তুলে জাতিকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে। কবি মরণকে শিবরূপে আহ্বান করছেন-

হাতের তোমার দন্ড উঠুক কেঁপে
এবার দাসের ভুবন ভবন ব্যেপে,-
মেষগুলোকে শেষ করে দেশ চিতার বুকে নাচো! [১৮]

বন্দী-বন্দনা গানটি নজরুলের কারাগারে অবস্থানকালীন অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। কবি অতি প্রত্যুষে বন্দী জীবনে মুক্তির কোলাহল শুনতে পেয়েছেন। কবির ভাষ্য

আজি রক্ত নিশি-ভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খল ,
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি হাসি হাসে,
টুটেছে ভয়ে-বাধা স্বাধীন হিয়া তলে।। [১৯]

কারাগারে বন্দী-জীবণ যাপনকারী বন্দীদের শৃঙ্খল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, শত-ভয়-বাঁধা সত্ত্বেও তাদের মুখের হাসি, চোখের সত্য-জ্যোতি শিখা, কণ্ঠের স্বাধীনতার বাণী ত্রিংশ কোটি মানুষের মধ্যে অনুরণিত হয়েছে।

ললাটে লাঞ্ছনা-রক্ত -চন্দন,
বক্ষে গুরুত শিলা, হস্তে বন্ধন,
নয়নে ভাস্বর সত্য জ্যোতি শিখা,
স্বাধীন দেশ-বাণী কণ্ঠে ঘন বোলে,
সে ধ্বনি ওঠে রণি ত্রিংশ কোটি ঐ
মানব কল্লোলে।। [২০]

Dhaka University Institutional Repository

গানের শেষ ক'টি পংক্তিতে অনবদ্য ভাষায় বীরদের চলার পথকে গৌরবোজ্জ্বল করা হয়েছে।

ললাটে জয়টীকা, প্রসূন-হার-গলে
চলেবে বীর চলে;
সে নহে নহে কারা , সেখানে ভৈরব-
রুদ্র-শিখা জ্বলে।। [২১]

সর্বহারা কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩৩৩ সাল (১৯২৬)। এই কাব্যগ্রন্থটিতে নজরুলের সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণার পরিচয় রয়েছে। জীবনের এই পর্যায়ে নজরুল কমরেড মুজফ্ফর আহমদ প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে আসেন এবং সাম্যবাদের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে সর্বপ্রকার শোষণ নিপীড়ন, বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, যা কি না সর্বহারা কাব্যের মূল সুর। "কান্ডারী হুঁশিয়ার' নজরুলের এই সাম্যবাদী ভাবধারার গান। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন বসে। কংগ্রেসের এই প্রাদেশিক সম্মেলনে 'হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট' বা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বাতিল হয়ে যায়। এই প্যাক্টে মুসলমানদেরকে কিছু কিছু রাজনৈতিক সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কৃষ্ণনগর সম্মেলনে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল লেখেন ' কান্ডারী হুঁশিয়ার' শীর্ষক গান। নজরুল ২২শে মে তারিখে দিলীপকুমার রায়ের সহযোগিতায় সম্মেলনে গানটি পরিবেশন করেন। [২২]

'কান্ডারী হুঁশিয়ার' গানটি জাতির ইতিহাসে এক ক্রান্তিলগ্নে লেখা অত্যন্ত জনপ্রিয় স্বদেশী সঙ্গীত। দেশ যখন পরাধীনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রামে উত্তাল, অসংখ্য দেশপ্রেমিক বিপ্লবী কারাগারে বন্দী, কোন পথে স্বাধীনতা অর্জিত হবে এ নিয়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলছে, তখন বিদেশী চক্রের ষড়যন্ত্রে দেশে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই ভয়াবহ সংকটের পটভূমিতে নজরুলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় সাবধান বাণীঃ

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পাবারার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কান্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।

Dhaka University Institutional Repository

"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কান্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার। [২৩]

'কান্ডারী হুঁশিয়ার' সম্পর্কে সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর 'নজরুল চরিতমানস' গ্রন্থে লিখেছেন, "কান্ডারী হুঁশিয়ারের কান্ডারী জনগণ মন অধিনায়ক। তিনি জাতীয় জীবনতরণীকে স্বাধীনতার কূলে নিয়ে যাবেন সময়ের দুরন্ত দুর্যোগকে অতিক্রম করে। এই অধিনেতার মাতৃমুক্তিপণ সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে বিরাজিত। ভ্রাতৃত্ববোধ ও স্বাধীনতা স্পৃহায় তরণীর যাত্রীরা উদ্দীপ্ত। নিরাভরণ ভাষায় রচিত এই গানটিতে গভীর দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রধ্বনির মতো বেজে উঠেছে।" [২৪]

গানটিতে রাজনৈতিক দুর্যোগের অনুষঙ্গরূপে এসেছে দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার ইত্যাদির চিত্রকল্প। পলাশীর প্রান্তর, ক্লাইভ ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করে কবি জাতীকে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং এর পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেছেন। পাশাপাশি স্বাধীনতা আনতে ক্ষুদিরামের মত বীরদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করে কবি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, তাদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে পারে না। জাতীর ক্রান্তিলগ্নে এই কঠিন পরীক্ষায় জাতি উত্তীর্ণ হবে; স্বাধীনতার সূর্য পুনরায় উদিত হবে।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তির জন্য নজরুল আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। দেশের স্বাধীনতা অর্জন, জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাই ছিল নজরুলের রাজনৈতিক দর্শনের প্রধান লক্ষ্য এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাঁর রাজনীতি বিষয়ক গানগুলি রচিত হয়েছে।

ব্যক্তি বিষয়ক গানঃ নজরুল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অঙ্গনের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যেমন মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, (১৮৮৭-১৯৫৪) চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) প্রমুখকে নিয়ে প্রশস্তি বন্দনামূলক গান লিখেছেন।

প্রথম দিকে নজরুল গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। চরকায় সুতা কেটে দেশী পণ্যে জনগণকে অভ্যস্ত করানো এবং তাঁতীদের অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টাকে তিনি স্বাগত

Dhaka University Institutional Repository

জানিয়েছেন। 'বাঙলার মহাত্মা' শীর্ষক গানে গান্ধীজীর আগমনে সমাজ জীবনে নব জাগরণের আভাস পেয়েছেন।

"আজ না চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে,
কংস-কারার দ্বার ঠেলে।
আজ শব-শ্মশানে শিব নাচে ঐ ফুল-ফুটানো পা ফেলে।।[২৫]

এই গানটি ১৯২৪ সালে, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ বঙ্গাব্দে মহাত্মা গান্ধীর হুগলী জেলায় আগমন উপলক্ষে রচিত হয়।[২৬] পরবর্তীকালে কবি গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে বিপ্লববাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

গান্ধীজীর উদ্যোগে চরকায় সূতা কেটে দেশীয় বস্ত্রে দেশের চাহিদা মেটানোর যে উদ্যোগ নেওয়া হয় তাকে স্বাগতম জানিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২); 'চরকার গান' ও 'চরকার আরতি' শীর্ষক দু'টি কবিতা লেখেন।[২৭] নজরুলও চরকায় সূতা কাটার কর্মসূচীকে স্বাগতম জানিয়ে লেখেন 'চরকার গান। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় যেমন হালকা চটুল ছন্দে অনুপ্রাসের বহুল ব্যবহারে চরকার ঘর ঘর শব্দকে বাঙময় করা হয়েছে; নজরুলের গানে বাহ্যিক আড়ম্বরের চেয়ে বক্তব্য প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন:

ঘোর-
ঘোর্ রে আমার সাধের চরকা ঘোর
স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর ।।[২৮]

নজরুল চরকার ঘর ঘর শব্দকে গান্ধীজীর ঘোষিত স্বরাজ সিংহদ্বার খোলার আভাস মনে করেন। তিনি আশা করেন চরকার মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায় ভাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে একজোট হয়ে কাজ করে যাবে। তাই গান্ধীজীর প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে তিনি লিখেছেনঃ

হিন্দু-মুসলিম দুই সোদর,
তাদের মিলন -সূত্র ভোর রে
রচলি চক্রে তোর,

Dhaka University Institutional Repository

তুই ঘোর ঘোর ঘোর।

আবার তোর মহিমায় বুঝ্‌ল দু'ভাই মধুর কেমন মায়ের ক্রোড়। [২৯]

'চরকার গান' ভারতী পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সালে প্রকাশিত হয়। গানটি কবি মহাত্মা গান্ধীকে ১৯২৪ সালের মে মাসে গেয়ে শোনান। [৩০]

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের তিরোধানে নজরুল দু'টি গান লেখেন। মাসিক পত্রিকা মোহাম্মদীতে ভাদ্র, ১৩৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় 'দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের তিরোধানে' শীর্ষক গান। [৩১] এটি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। যতীন্দমোহনের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ তার সুযোগ্য সন্তানকে হারিয়ে বেদনায় ভারাক্রান্ত । নজরুলের ভাষায়-

"দেশপ্রিয় নাই শুনি ক্রন্দন সহসা প্রভাতে জাগি;
আকাশে ললাট হানিয়া কাঁদিছে ভারত চির-অভাগী"।। [৩২]

দেশের জন্য যতীন্দ্রমোহনের অকাতরে সর্বস্ব মিলিয়ে দেওয়া, কারাগারে আত্মীয়-পরিজন বিহীন জীবন-যাপন প্রভৃতি সকল আত্মত্যাগই কবি স্মরণ করেছেন। তাঁর কর্মই তাকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সমপর্যায়ে স্থান করে দিয়েছে। যতীন্দ্রমোহনের প্রয়াণ ভারতবর্ষের জনগণের মনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কবির ইচ্ছা তাঁর অপূর্ণ ইচ্ছা আমরা যেন পূর্ণ করতে পারি। তাঁর কর্ম তাঁকে অমর করে রাখবে এই কবির প্রত্যাশা।

এক যতীন্দ্র অযুত পরানে ছড়ায়ে পড়েছে আজি,
জনসমুদ্র-কল্লোলে তারি শঙ্খ উঠিছে বাজি;
হে বীর, তোমার সাধ অপূর্ণ, মোরা যেন পারি করিতে পূর্ণ;
মৃত্যুতীর্থ হতে এনো তুমি অমর জীবন মাগি।। [৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

'জাগো জাগো জাগো হে দেশপ্রিয়' শীর্ষক গানটিও যতীন্দ্রমোহনের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে রচিত ও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গান।[৩৪] এটি একটি অনবদ্য ভাষায় রচিত শোকগীতি। এতে তাঁর মাহপ্রয়াণে শোকে মুহ্যমান ভারতবাসীর অনন্ত শোক প্রকাশ পেয়েছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্রয়াণে তিনি লিখেন 'বিশাল-ভারত-চিত্তরঞ্জন হে দেশবন্ধু এসো ফিরে'।[৩৫] এটি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। চিত্তরঞ্জনকে কবি জাতির কান্ডারী হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মহাপ্রস্থানে জাতি আজ দিশাহারা।

ব্যক্তি বিষয়ক গানে সমসাময়িককালের জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী গানের উপজীব্য বিষয় হয়েছে। যেমন অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন গান্ধীর স্বরাজ প্রতিষ্ঠার দাবীকে তিনি গানে স্বাগত জানিয়েছেন। তেমনি জাতীয় নেতৃবৃন্দের মহাপ্রয়াণ তাঁকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করেছে। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ দেশবরেণ্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের মৃত্যুতে তাঁদের কর্মময় জীবনকে স্মরণ করে শোকগাঁথা রচনা করেছেন। কবির আহ্বান এই শোককে শক্তিতে পরিণত করতে হবে। তাই এসকল গান ব্যক্তিগত শোকগাঁথা না থেকে জাগরণধর্মী সমাজ-সচেতন গানে পরিণত হয়েছে।

রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক গানঃ ব্যঙ্গগীতির সূচনা উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এর সঙ্গে দেশচেতনার ব্যাপারটিকে যুক্ত করার যায়। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সংঘর্ষে আসা এবং শিক্ষিত বাঙালির অতি পাশ্চাত্য প্রীতিই ছিল ব্যঙ্গগীতির বিষয়। ব্যঙ্গ এবং রঙ্গ উভয় ধারাতেই গান রচনা করেছিলেন নজরুল। ব্যঙ্গগীতির অধিকাংশই দেশচেতনার পটভূমিতে রচিত; এর মুখ্য বক্তব্য রাজনৈতিক।

'চন্দ্রবিন্দু গ্রন্থের ১৮টি গান, 'সুর-সাকী'র কয়েকটি গান হাসির গান হিসেবে উল্লেখযোগ্য। 'চন্দ্রবিন্দু' সঙ্গীত গ্রন্থের 'কমিক গান' অংশের ১৮টি গানের সব ক'টিই কম বেশী হাস্যরসে পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থের অন্তর্গত কমিক গানগুলির বিশেষত্ব হচ্ছে এগুলোর প্রায় সবগুলোই রাজনৈতিক সামাজিক ঘটনাবলী বা সামাজিক অসঙ্গতির প্রেক্ষাপটে লেখা। যেমন বিশেষ করে

Dhaka University Institutional Repository

'প্যাক্ট', 'সর্দা বিল', রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স', 'সাইমন কমিশনের রিপোর্ট', 'প্রাথমিক শিক্ষা বিল' শীর্ষক গানগুলি নজরুলের গভীর রাজনৈতিক বোধের পরিচয় দেয়।

ধূমকেতু পত্রিকার ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২২ সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার জন্য নজরুলের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। বিচারে ১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী তাঁর এক বছর সশ্রম কারাদন্ড হয়। প্রথমে সেন্ট্রাল জেলে তাঁকে রাখা হয়; পরে ১৯২৩ সালের ১৪ই এপ্রিল সেন্ট্রাল জেল থেকে হুগলী জেলে আনা হয়। হুগলী জেলে থাকাকালীন তিনি 'সুপার বন্দনা', শীর্ষক গানটি রচনা করেন; যার প্রথম চরণ হচ্ছে 'তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে' গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে তুমি ধন্য ধন্য হে' গানটির প্যারডি। সেসময়ে জেলের সুপারের দুর্ব্যবহারের অতিষ্ট হয়ে নজরুল এই গানটি লিখেন। [৩৬]

'ভাঙার গান' কাব্যের অন্তর্গত 'মোহান্তের মোহ-অন্তের গান' তারকেশ্বর মন্দিরের মোহান্তের বিরুদ্ধে ১৩৩১ সালে রচিত গান। তারকেশ্বর মন্দিরের বিরাট মাঠে 'সত্যাগ্রহ আন্দোলান'-এর সভায় নজরুল উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে গানটি গেয়েছিলেন । চিত্তরঞ্জন দাশ সেসময় সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। [৩৭]

প্রাণতোর চট্টোপাধ্যায় ওই আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি লিখেছেন: "তৎকালে এই গানটি ('জাগো আজ দন্ড হাতে চন্ড বঙ্গবাসী'---) হুগলী জেলার গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে এবং সারা বাংলাদেশে নজরুল তাঁর বজ্রকণ্ঠে গেয়ে বেড়ান, যার ফলে সত্যাগ্রহে হাজার হাজার তরুণ, মধ্য বয়সী ও বৃদ্ধ স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলনের পতাকার নীচে এসে শামিল হয়েছিল"। [৩৮]

দীর্ঘ গানটিতে মোহান্তের নানা অপকর্মকে কবি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বাণে জর্জরিত করেছেন। সাধারণ মানুষেকে প্রতারিত করে, ধর্মের নামে ব্যবসা করে মোহান্ত দিনে দিনে টাকার পাহাড় গড়েছে। তার সুরক্ষায় রয়েছে লাঠিয়াল বাহিনী। মোহান্তের মুখোশ উন্মোচন করে নজরুল লিখেছেনঃ

Dhaka University Institutional Repository

মোহের যার নাই ক'অন্ত

পূজারী সেই মোহান্ত,

মা-বোনে সর্বস্বান্ত করছে বেদী-মূলে।

--- --- ---

পূণ্যের ব্যবসাদারী

চালায় সব এই ব্যাপারী,

জমাচ্ছে হাঁড়ি হাঁড়ি টাকার কাঁড়ি ঘরে। [৩৯]

১৯২৭ সালে ভারতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে সাইমন কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনে কোন ভারতীয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় এর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এর রিপোর্ট যে ভারতীয়দের জন্য শুভ হবে না এটা বুঝতে পেরে এর বিরুদ্ধে ভারতের সর্বত্র তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে নজরুল লেখেন 'সাইমন কমিশনের রিপোর্ট'। রিপোর্টের অন্ত-সারশুন্যতা তুলে ধরেছেন তাঁর গানে-

যীশু খ্রিস্টের নাই সে ইচ্ছ,

কি করিব বল আমরা।

চাওয়ার অধিক দিয়া ফেলিয়াছি

ভারতে বিলিতি আমড়া।।

আঁটি ও আমড়া বিলিতি আমড়া

মন্টেগু, দিল চুষিতে;

শ্বাস নাই বলে কাঁদিল, দিলাম,

বিলিতি কুমড়ো তুষিতে। [৪০]

কংগেস সাইমন কমিশন বর্জন করলে ১৯২৮ সালের মে মাসে পন্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে বৃটিশ সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে ডোমিনিয়ন স্টেটাস পাবার মত করে শাসনতন্ত্র রচনা করা হয়। এর পক্ষে বিপক্ষেও প্রচুর তর্ক বিতর্ক হয়। শেষ পর্যন্ত ডোমিনিয়ন স্টেটাস প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ওঠে। নজরুল এই দাবীর সপক্ষে লেখেন 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'।

Dhaka University Institutional Repository

বগল বাজা দুলিয়ে মাজা,

বসে কেন অমনি রে।

ছেঁড়া ঢোলে লাগাও চাঁটি

মা হবেন আজ ডোম্‌নী রে !! [৪১]

চাকুরী ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে সমান অধিকার দিয়ে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট করা হলে এই মৈত্রীকে নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ গান 'প্যাক্ট' লেখেন। 'প্যাক্ট' শীর্ষক গানে যেভাবে ব্যঙ্গরস এনেছেন তা বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। শুরুতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সহাবস্থান দেখানো হয়েছেঃ

বদনা-গাড়ুতে গলাগলি করে,

নব-প্যাক্টের আস্‌নাই,

মুসলামানের হাতে নাই ছুরি,

হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই।। [৪২]

এই প্যাক্টের পরিণতি কী হবে তাও তিনি দেখিয়েছেন। তিনি মনে করেন চুক্তি করে সম্পর্কের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা। গানের শেষ ক'টি পংক্তিতে হাস্যরসাত্মকভাবে প্যাক্টের পরিণতি বর্ণনা করেছেন।

বদনা গড়ুতে পুনঃ ঠোকাঠুকি

রোল উঠিল "হা হন্ত!"

ঊর্ধ্বে থাকিয়া সিঙ্গী-মাতুল

হাসে চিরকুটি দন্ত!

মসজিদ পানে ছুটিলেন মিঞা,

মন্দির পানে হিন্দ,

আকাশে উঠিল চির জিজ্ঞাসা

করুণ চন্দ্রবিন্দু! [৪৩]

১৯২৯ সালের ৩১শে আগস্ট বড়লাট লর্ড আরউইন ঘোষণা করেন সে সাইমন কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতের নতুন শাসনতন্ত্র গঠন করার উদ্দেশ্যে লন্ডনে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স বসবে। নজরুল এর বিপক্ষে লেখেন 'রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স' শীর্ষক ব্যঙ্গগান। রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ভারতীয়দের জন্য কোন সুফল বয়ে আনবে না নজরুল এটা দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি লিখেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

দড়াদড়ির লাগবে গিঠ

গোল টেবিলের বৈঠকে।

ঠোকর মারে লোহার ইট,

এ ঠকে কি ঐ ঠকে।।

--- --- ---

ডিম গোলাকার গোল টেবিল

করবে সার্ভে অশ্ব ডিম, [৪৪]

শিশু বিবাহ রোধকল্পে প্রণীত 'সর্দা এ্যাক্ট' নামক বিলের প্রেক্ষাপটে লেখেন 'সর্দা বিল'। ১৯২৩ সালে প্রণীত এই বিলে মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স সীমা বাড়িয়ে চৌদ্দ করা হয়। রায় সাহেব হরবিলাস সর্দা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই বিল উথাপন করেন। 'সর্দা-এ্যক্ট-'এর সামাজিক প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে নজরুল ব্যঙ্গগান 'সর্দা -বিল ' লেখেনঃ

ডুবলো ফুটো ধর্ম-তরী,

ফাটল মাইন সর্দার।

--- --- ---

সিঙ্গি চড়া ধিঙ্গি মেয়ে

বৌ হবে কি, বাপ-রে!

প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণেই

হয়ত দেবে থাপড়ে !

লাফ দিয়ে সে বাইরে যাবে

ঝাঁপ খুলে ঐ পর্দার ।।[৪৫]

নজরুলের রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক গানে তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা, দূরদৃষ্টি, গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় রয়েছে। ব্রিটিশ শাসকদের গৃহীত বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অসারতা তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। আবদুল কাদির (সম্পাদিত) নজরুল রচনাবলী ১ম খ. (সন্ধ্যা, চল্ চল্ চল্), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ, ৫৪২

২। বিশ্বনাথ দে (সম্পাদিত) নজরুল স্মৃতি, 'কবি বিপ্লবী নজরুল' ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়, সাহিত্যম্, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ২৫

৩। রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সাহিত্য, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ২৯৭

৪। মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৮৭

৫। প্রাগুক্ত, নজরুল রচনাবলী ১ম খ. (প্রলয়োল্লাস, অগ্নিবীণা) পৃ. ৫

৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

১০। মুজফ্ফর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

১১। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩

১২। প্রাগুক্ত, নজরুল রচনাবলী ১ম খ. (ভাঙার গান, ভাঙার গান), পৃ. ১৩৯

১৩। উদ্ধৃত, করুনাময় গোস্বামী, নজরুল গীতি প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২২

১৪। মুজফ্ফর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১১৯

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

১৬। সুশীলকুমার গুপ্ত, নজরুল চরিতমানস, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৩৯৫, পৃ. ১৬৫

১৭। প্রাগুক্ত, নজরুল রচনাবলী ১ম খ. (জাগরণী, ভাঙার গান) পৃ. ১৪০

১৮। প্রাগুক্ত (মরণ-বরণ, বিষের বাঁশী) পৃ. ১০৮

১৯। প্রাগুক্ত (বন্দী-বন্দনা, বিষের বাঁশী), পৃ, ১০৯

২০। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

২১। প্রাগুক্ত , পৃ. ১০৯

২২। রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবনও সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

২৩। প্রাগুক্ত, নজরুল রচনাবলী ১ম খ. (কাণ্ডারী হুঁশিয়ার, সর্বহারা) পৃ. ২৮৮

২৪। সুশীলকুমার গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

২৫। আবদুল আজীজ আল আমান (সম্পাদিত) নজরুল-গীতি অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৪২৮

২৬। কল্পতরু সেনগুপ্ত (সম্পাদিত) নজরুল গীতি সহায়িকা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমী, ১৯৯৭ পৃ. ১২

২৭। সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল চরিতমানস, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৩৯৫, পৃ. ১৬১

২৮। আবদুল কাদির (সম্পাদিত) নজরুল রচনাবলী ১ম খ., বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬.পৃ. ১১৪

২৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

৩০। প্রাগুক্ত, নজরুলগীতি সহায়িকা, পৃ. ১৮৩

৩১। প্রাগুক্ত,নজরুলগীতি সহায়িকা, পৃ. ২৬৯

৩২। প্রাগুক্ত, নজরুল রচনাবলী ৩য় খ. (গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত), পৃ. ৫৪৩

৩৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৪

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৩

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩২

৩৬। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল, ৩য় সং, এ, মুখার্জী, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ.৫২

৩৭। কল্পতরু সেনগুপ্ত, নজরুলগীতি সহায়িকা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ২০৬

৩৮। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুপ্ত, পৃ, ৯০

৩৯। প্রাগুপ্ত, নজরুল রচনাবলী ১ম খ. (ভাঙার গান, মোহান্তের মোহ-অন্তের গান), পৃ.১৪৬

৪০। আবদুল কাদির (সম্পাদিত) নজরুল রচনাবলী ২য় খ. (সাইমন কমিশনের রিপোর্ট, চন্দ্রবিন্দু), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৪৬

৪১। প্রাগুক্ত (ডোমিনিয়ন স্টেটাস, চন্দ্রবিন্দু), পৃ. ১৩৫

৪২। প্রাগুক্ত (প্যাক্ট, চন্দ্রবিন্দু) পৃ. ১২৭

৪৩। প্রাগুক্ত (প্যাক্ট, চন্দ্রবিন্দু), পৃ. ১২৯

৪৪। প্রাগুক্ত, (রাউন্ড-টেবিল-কনফারেন্স, চন্দ্রবিন্দু), পৃ. ১৩৯

৪৫। প্রাগুক্ত, (সর্দা-বিল, চন্দ্রবিন্দু) পৃ.১৩০

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

সমাজসচেতনতা নজরুলের কবিতার মত বেশ কিছু গানে নানাভাবে এসেছে। এমন সমাজসচেতন গান উদ্দেশ্যমূলক হলেও বাণী ও শিল্প বিচারে অসাধারণ। নজরুলের গানের শ্রেণীবিভাগ করে পাওয়া গেল, তাঁর সমাজসচেতন সঙ্গীতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। নজরুলের গানের শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্নভাবে করেছেন। এ সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া গেলেও মোটামুটিভাবে বলা যায় আমাদের করা বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগটি গ্রহণযোগ্য।

তাঁর অজস্র ধর্মীয় সঙ্গীত তাঁর উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় বহন করে। তাঁর মধ্যে কোন ধর্মীয় গোঁড়ামী ছিল না। তাঁর আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা ছিল মানবতার পক্ষে। তাঁর লেখা ইসলামী গান ও শ্যামাসঙ্গীত ভাবে ও চিন্তা-চেতনায় পরস্পর আপাত বিরোধী মনে হলেও কবির স্বভাবগত উদারতা দিয়ে অনুভব করলে এই আপাতবিরোধী অভিব্যক্তির কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। সকল রকম নীচতা, সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ছিলেন তিনি। মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসাই ছিল তাঁর ধর্মীয় চিন্তার মূল চালিকা শক্তি। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ -খ্রিস্টান যে কোন মানুষই ছিল তাঁর কাছে সমান।

তাঁর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক বাংলা গানের অপর চারজন প্রধান সঙ্গীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৬৫-১৯৩৪) এঁদের সাথে তাঁর গানের মৌলিক প্রার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। সেদিক থেকে তাঁকে অনন্য সঙ্গীতস্রষ্টা বলা যায়।

এই সঙ্গীতগুলির শক্তিধর্মের জন্য এগুলোর আবেদন বাঙালীর জীবনে কখনো নিঃশেষ হবে না। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটকে নজরুল যে সমাজসচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন তারই সুর-মুর্ছনা হল এই সমাজসচেতন সঙ্গীতগুলো। জাতীয় জীবনে অনেক সময় সমস্যা-সংকট আসতে পারে। মানুষের ব্যক্তি জীবনেও সমস্যা সংকট চিরদিনই কোন না কোনভাবে থাকে। আর সেগুলো উত্তরণের জন্য এই সঙ্গীতগুলো উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সক্ষম। নজরুলের গান মানুষকে সংকট থেকে উত্তরণের পথ দেখায়। নজরুলের সমাজসচেতন সঙ্গীত অতীতে যেমন বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করেছে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সংকট উত্তরণে, ভবিষ্যতেও তা করে যাবে।

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের সমাজসচেতন সঙ্গীত এক বিশেষ ধারা রীতির প্রবর্তক। এই সঙ্গীতগুলোর ভাব, ভাষা, সুর এবং অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা যেন শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষেরই চাওয়া-পাওয়ার কথা। সেদিক থেকেও নজরুলের এই সমাজসচেতন সঙ্গীতগুলো চির অক্ষয় হয়ে থাকবে। নজরুল তাঁর সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সমাজসচেতন সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সঙ্গীতশক্তি ও প্রতিভার এক উজ্জ্বল প্রকাশ এই জাতীয় সঙ্গীতগুলি।

বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাসে বহুমাত্রিক সঙ্গীত সাধনায় নজরুল তুলনাহীন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

(ক) মূল গ্রন্থঃ

আবদুল কাদির (সম্পাদিত) নজরুল রচনাবলী ১ম-৪র্থ খ., ১ম পু.মু., নতুন সং, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৬

আবদুল আজীজ আল আমান (সম্পাদিত) নজরুল গীতি অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলাকাতা, ১৯৯৩

(খ) সহায়ক গ্রন্থঃ

১। অজিত কুমার ঘোষ, (সম্পাদিত) রাম মোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৩

২। অতুল চন্দ্র রায়, ভারতের ইতিহাস ২য় খ., মৌলিক লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৯৮

৩। অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা, ৫ম মু., ১৪০৯।

৪। অরুণ কুমার বসু, বাংলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্র সঙ্গীত, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৭৮

৫। আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪

৬। আতোয়ার রহমান, নজরুল বর্ণালী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা,১৯৯৮

৭। আতাউর রহমান, নজরুলঃ ঔপনিবেশিক সমাজে সংগ্রামী কবি, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৩

৮। আনোয়ারুল করিম, বাউল সাহিত্য ও বাউল গান, নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা, ১৯৭১

৯। আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা ১৯৮৯

১০। আবদুল কাদির যুগ-কবি নজরুল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা. ১৯৮৬

১১। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৮৯

১২। আহমদ শরীফ (সম্পাদিত) সৈয়দ সুলতান বিরচিত নবীবংশ ১ম খ. , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮।

১৩। আহমদ শরীফ (সম্পাদিত) সওয়াল সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৮৩

১৪। আহমদ শরীফ (সম্পাদিত) মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৬৯

১৫। এ.কে.এম আবদুল আলিম, ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় সং, ১৯৭৩

১৬। এ,কে, এম শাহজাহান, ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা . ঢাকা. ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

১৭। ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭

১৮। কমল কুমার সান্যাল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগ্রামী কারা?, কান্তিরঞ্জন ঘোষ, কলকাতা, ১৯৭৯

১৯। করুণাময় গোস্বামী, নজরুল গীতি প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮

২০। করুণাময় গোস্বামী, বাংলা গানের বিবর্তন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

২১। করুণাময় গোস্বামী, বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০

২২। করুনাময় গোস্বামী, রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিক্রমা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

২৩। কল্পতরু সেনগুপ্ত (সম্পাদিত) নজরুল গীতি সহায়িকা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, ১৯৯৭

২৪। কল্যানী কাজী (সম্পাদিত) শতকথায় নজরুল, সাহিত্যম্, কলকাতা, ১৪০৫

২৫। খান বাহাদুর আব্দুল হাকিম (সম্পাদিত).বাংলা বিশ্বকোষ ২য় খ., মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৫

২৬। গীতা চট্টোপাধ্যায়, বাংলা স্বদেশী গান, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী, ১৯৮৩

২৭। গোলাম সাকলায়েন, মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক, নওরোজ কিতাবিস্তাব, ঢাকা, ১৯৬৭

২৮। জয়গুরু গোস্বামী, চারণকবি মুকুন্দ দাস, বিশ্ববাণী, কলকাতা, ১৯৭৮

২৯। দীপা মুখোপাধ্যায় ও সুহাস চৌধুরী (সম্পাদিত) সলিল চৌধুরীর গান, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৭৫

৩০। নারায়ণ চৌধুরী,কাজী নজরুলের গান, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি, কলিকাতা, ১৯৭৭

৩১। নারায়ণ চৌধুরী, নজরুল চর্চা, মুক্তধারা, ১৯৯০

৩২। প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত) কান্তকবি রচনাসম্ভার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৬৯

৩৩। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, এ, মুখার্জী, কলিকাতা, ৩য় সং, ১৯৭৭

৩৪। বিশ্বনাথ দে (সম্পাদিত) নজরুল স্মৃতি, 'কাজীদার কথা', আব্বাস উদ্দীন আহমদ, সাহিত্যম, কলিকাতা, ১৯৭৫

৩৫। বিশ্বনাথ দে (সম্পাদিত) নজরুল স্মৃতি, 'কবি বিপ্লবী নজরুল', ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়, সাহিত্যম্, কলিকাতা, ১৯৭৩

৩৬। মুজফফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, মুক্তধারা, ঢাকা- ১৯৯৯

৩৭। মুনতাসীর মামুন, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ঢকা, ১৯৯৯

৩৮। মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত) ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৩৭৬

Dhaka University Institutional Repository

৩৯। মানসী মুখোপাধ্যায়, অতুল প্রসাদ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-১৯৭১

৪০। মাযহারুল ইসলাম, ড., কবি হেয়াত মামুদ, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী, ১৯৬১

৪১। রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকে নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ১৯৯৯

৪২। রথীন্দ্রনাথ রায়(সম্পাদিত) দ্বিজেন্দ্র রজনাবলী ১ম খ., কলকাতা . সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৬

৪৩। রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য ১ম সং, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯১

৪৪। রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও সৃষ্টি, ২য় সং, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৭

৪৫। রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সৃজন, নজরুল ইনষ্টিটিউট, ঢাকা, ২০১২

৪৬। রফিকুল ইসলাম, নজরুল প্রসঙ্গে, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮

৪৭। রফিকুল ইসলাম, গীতি সংকলন ২য় খ., বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫

৪৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা ১৯৯২

৪৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী ৩য় খ., বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৭১

৫০। শাহরীয়ার ইকবাল, মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৫

৫১। শিশির কর, নিষিদ্ধ নজরুল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮

৫২। যোগেসচন্দ্র বাগল, হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত- ১ম প্র., মৈত্রী, কলিকাতা, ১৩৫২

৫৩। সরোজ দত্ত ও অলোক রায়, রবীন্দ্রনাথের কালান্তর, বাগর্থ, কলিকাতা, ১৯৭০

৫৪। সুকুমার রায়, বাংলা সংগীতের রূপ, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯১

৫৫। সুনীলময় ঘোষ, অতুল প্রসাদ সমগ্র, ৩য় সং, সাহিত্যম্, কলকাতা, ২০০৭

৫৬। স্বামী বামদেবানন্দ, সাধক রামপ্রসাদ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৫

৫৭। হুমায়ুন আজাদ, নারী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

অভিসন্দর্ভ-এ উল্লেখিত গানসমূহের রাগ ও তাল।

১।	গানগুলি মোর আহত পাখির সম।	রাগঃ ভৈরবী; তাল: দাদরা;একতাল
২।	হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে	রাগ: বাগেশ্রী; তাল লাউনী (৮মাত্রা);কাহারবা
৩।	যাও তুমি ফিরে এই মুছিনু আখি।	রাগ: ভৈবরী; তাল: দাদরা
৪।	কেন কাঁদে পরান কী বেদনায় কারে কহি।	রাগ: মিশ্র বেহাগ;তিলোক কামোদ;খাম্বাজ; তাল: দাদরা
৫।	শুন্য এ বুকে পাখি মোর আয় ফিরে আয় ফিরে আয়।	রাগ: ছায়ানট; তাল: একতাল
৬।	পাষাণের ভাঙলে ঘুমে কে তুমি সোনার ছোওয়ায়।	রাগ: ভীমপলশ্রী; তাল: দাদরা
৭।	ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি।	রাগ: ইমন ভূপালী;ভীম পলশ্রী মিশ্র; তাল: দাদরা
৮।	বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল।	রাগ: ভৈবরী; তাল কার্ফা
৯।	কে দুরন্ত বাজাও ঝড়ের ব্যাকুল বাঁশি।	রাগ: হিন্দোল মিশ্র; তাল: ললিত পঞ্চম/তেওড়া
১০।	এস হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া।	রাগ; আড়ান; তাল: তেতাল
১১।	এল বরষা শ্যাম সরসা প্রিয় দরশা।	রাগ: সুরদাসী মল্লার; তাল: ত্রিতাল
১২।	মেঘের হিন্দোলা দেয় পূব হাওয়াতে দোলা।	রাগ: পিলু কাফী; তাল: দাদরা (কাজরী)
১৩।	এস শারদ প্রাতের পথিক/এস শিউলি বিছানো পথে।	রাগ: সিন্ধু মিশ্র/কাফী; তাল: দাদরা
১৪।	হৈমন্তিকা এস এস হিমেল শীতল বন তলে।	রাগ: হেমন্ত; তাল: দাদরা
১৫।	ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ।	রাগ: পিলু; তাল: কাহারবা
১৬।	আল্লা নামের বীজ বুনেছি।	তাল: দ্রুত দাদরা
১৭।	নাম মোহাম্মদ বোলরে মন;নাম আহমদ বোল।	রাগ: নাত; তাল: কাহারবা
১৮।	আল্লাহ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়।	রাগ: ভৈরবী; তাল কাহারবা
১৯।	ত্রিভূবনের প্রিয় মোহাম্মদ এল রে দুনিয়ায়।	
২০।	এলো আবার ঈদ ফিরে এলো আবার ঈদ;চলো ঈদগাহে।	তাল: কাহারবা

Dhaka University Institutional Repository

২১। ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এল নবীন সওদাগার। রাগ: ভৈরবী; তাল: কাহারবা

২২। বাজল কিরে ভোরের সানাই নিদ মহলার আঁধার পুরে।

২৩। বক্ষে আমার কাবার ছবি চক্ষে মোহাম্মদ রসুল; রাগ: বাগেশ্রী সিন্ধু; তাল কাফা

২৪। সর্বপ্রথম বন্দনা গাই তোমারই ওগো বারী তালা।

২৫। বুঝলাম নাথ এত দিনে।

২৬। আমি যদি আরব হতাম মদিনারই পথ। তাল: কাহারবা

২৭। রোজ হাশরে আল্লা আমায় করোনা বিচার। রাগ: ভৈরবী; তাল: একতাল

২৮। ওরে গুলার! নিরিবিলি নবীর কদম ছুঁয়েছিল।

২৯। আয় মরুপারের হাওয়া,নিয়ে যারে মদিনায় রাগ: মাঢ় মিশ্র; তাল: দাদরা

৩০। মাতৃ নামের হোমের শিখা রাগ: মিশ্র দেশ/কানাড়া; তাল: জলদ একতালা/ তেওড়া

৩১। শ্যামা নামের ভেলায় চড়ে

৩২। মহাকালের কোলে এসে রাগ: দুর্গা/গীতাঙ্গী; তাল: তেওড়া

৩৩। কে বলে মোর মাকে কালো। তাল: তেওড়া

৩৪। বল রে জবা বল। রাগ: মিশ্র দেশ; তাল: দাদরা

৩৫। জাগো শ্যামা জাগো শ্যামা রাগ: সিন্ধু কাফি; তাল; যৎ

৩৬। মাতল গগন অঙ্গনে ঐ। রাগ: দরবারী কানাড়া মিশ্র; তাল: রূপক

৩৭। নাচে রে মোর কালো মেয়ে রাগ: নটনারায়ণ;তাল: তেওড়া

৩৮। নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে। রাগ: পঞ্চম; তাল: বিলম্বিত ও দ্রুত ত্রিতাল

৩৯। খড়ের প্রতিমা পূজিস তোরা। রাগ: ভৈরবী; তাল: দাদরা

৪০। এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোঁর উদ্বোধন। রাগ: মিশ্র ভৈরবী; তাল: দাদরা

৪১। লক্ষ্মী মাগো এস ঘরে।

৪২। লক্ষ্মী মা তুই আয় গো উঠে সাগর জলে সিনান করি রাগ: মাঢ়;তাল: কাহারবা

৪৩। কেন আমার আনলি মাগো। তাল: অর্ধঝাঁপ

৪৪। জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী রাগ: মিশ্র খাম্বাজ ; তাল: দাদরা, একতাল

৪৫। জয় মর্তের অমৃতবাদিনী। রাগ: ইমন ; তাল: কাহারবা

৪৬। ণমস্তে বীণা পুস্তক হস্তে

৪৭। সাজিয়াছ যোগী বল কার লাগি। রাগ: ধ্রুপদ; তাল: ঝাঁপতাল

৪৮। অরুণ কান্তি কে গো যোগী ভিখারী। রাগ: আহীর ভৈরব;তাল: ত্রিতাল

Dhaka University Institutional Repository

৪৯। ভিখারীর সাজে কে এলে। রাগ: ভিখার;তাল: ত্রিতাল

৫০। সৃজন চন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ। রাগ: তিলোক-কামোদ তাল: ঝাঁপতাল

৫১। নমো নমো নম: হে নটানাথ। রাগ: দুর্গা;তাল: গীতাঙ্গী

৫২। গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু। রাগ: মালকোষ;তাল: তেওড়া/ধামার

৫৩। এস শঙ্কর ক্রোধাগ্নি। রাগ: রুদ্রভৈরব; তাল: সুর ফাঁক তাল

৫৪। আমার দেশের মাটি । তাল: লোফা

৫৫। আমার শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের। রাগ: মিশ্র খাম্বাজ; তাল: দাদরা

৫৬। একি অপরূপ রূপে মা তোমায় । রাগ: বেহাগ মিশ্র;তাল: কাওয়ালী

৫৭। এস মা ভারত জননী । রাগ: জৈনপুরী মিশ্র; তাল: দাদরা

৫৮। গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ঐ। রাগ: খাম্বাজ;তাল: দাদরা

৫৯। জননী মোর জন্মভূমি । রাগ: মিশ্র সুর তাল: একতাল

৬০। ত্রিংশ কোটি তব সন্তান। তাল: ত্রিতাল

৬১। লক্ষ্মী মা তুই আয় গো ফিরে । রাগ: মাঢ়; তাল: কাহরবা

৬২। ভারত লক্ষ্মী মা আয় । রাগ: সুখরাই-কানাড়া;তাল: ত্রিতাল

৬৩। জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা । রাগ: সারং কাওয়ালী; তাল; ত্রিতাল

৬৪। আমি মহাভারতের শক্তি নারী

৬৫। চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা। তাল: দাদরা

৬৬। নূরজাহান! নূরজাহান ! সিন্ধু নদীতে ভেসে । তাল: কাহারবা

৬৭। জাতের নাম বজ্জাতি । রাগ: পরজ মিশ্র;তাল: দ্রুত দাদরা

৬৮। আজ ভারত ভাগ্যবিধাতার বুকে

৬৯। ঐ তেত্রিশ কোটি দেবতাকে তোর তেত্রিশ কোটি ভূতে

৭০। মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু -মুসলমান রাগ: ভৈরবী/একতালা; তাল: তেওড়া

৭১। দিকে দিকে পুন: জ্বলিয়া উঠেছে রাগ: মার্চের সুর ; তাল: কাহারবা

৭২। কোথায় তখত তাউস, কোথায় সে বাদশাহী রাগ; খাম্বাজ;তাল: কাহারবা

৭৩। জাগে না সে জোস লয়ে আর সে মুসলমান রাগ: ভৈরবী; তাল: কাহারবা

৭৪। ভুবনজয়ী তোরা কি হায় সেই মুসলামান রাগ: পাহাড়ী মিশ্র;তাল: কার্ফা

৭৫। ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি তাল; দ্রুত দাদরা

৭৬। বাজিছে দামামা;বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান। রাগ: মিশ্র ইমন;তাল: একতাল

Dhaka University Institutional Repository

৭৭।	আল্লাহ্ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয় ।	রাগ: ভৈরবী;তাল: কাহারবা
৭৮।	তওফিক দাও খোদা ইসলামে	রাগ: ইমন মিশ্র; তাল: পোস্তা
৭৯।	ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর কষে লাঙ্গল।	তাল: কাহারবা
৮০।	ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রী দল!	রাগ: মিশ্র খাম্বাজ; তাল: দাদরা
৮১।	আমরা নীচে পড়ে রইব না আর	
৮২।	ওড়াও ওড়াও লাল নিশান!	
৮৩।	ওরে ও শ্রমিক সব মহিমার উত্তর-অধিকারি।	
৮৪।	জাগো অনশন বন্দী, ওঠরে যত।	রাগ: ইন্টারন্যাশানাল সংগীতের সুর; তাল: কাহারবা
৮৫।	কারার ঐ লৌহ কপাট ।	তাল: দ্রুত দাদরা
৮৬।	বল ভাই মাভৈ: মাভৈ।	তাল: দাদরা
৮৭।	এই শিকলপরা ছল মোদের এ শিকলপরা ছল।	রাগ: খাম্বাজ;তাল: দাদরা
৮৮।	তোরা সব জয়ধ্বনি কর।	রাগ: রাগমালা;তাল: দ্রুত দাদরা
৮৯।	মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম।	রাগ: ব্যান্ডের সুর(ষষ্ঠী তাল ৬ মাত্রা); তাল: দাদরা
৯০।	দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার।	রাগ: বৃহন্নট কেদারা; তাল: একতাল
৯১।	চল্ চল্ চল্।	রাগ: মার্চের সুর ; তাল: দাদরা
৯২।	আমরা শক্তি আমার বল ।	রাগ: বাউল লোফা;তাল; দাদরা
৯৩।	অগ্রপথিক হে সেনাদল।	রাগ: মার্চের সুর
৯৪।	ওরে ছড়াদার that পাল্লাদার	
৯৫।	আমার হরিনামে রুচি ।	তাল; দাদরা
৯৬।	ওরে মাঝি ভাই।	তাল: কাহারবা
৯৭।	কি হইব লাল বাওটা তুইল্যা সাম্পানের উপর	
৯৮।	তোমায় কূলে তুলে বন্ধু আমি নামলাম জলে।	রাগ: ভাটিয়ালী; তাল: কাহারবা
৯৯।	ওরে ধ্বংস পথের যাত্রীদল ।	রাগ: মিশ্র খাম্বাজ;তাল: দাদরা
১০০।	জাগো অনশন-বন্দী, ওঠ রে যত।	রাগ: ইন্টারন্যাশনাল সংগীতের; সুর তাল: কাহারবা
১০১।	জাগিলে "পারুল" কিগো " সাত ভাই চমপা ডাকে ।	রাগ: ভীমপলশ্রী;তাল: দাদরা

Dhaka University Institutional Repository

১০২। মমতাজ !মমতাজ ! তোমার তাজমহল। তাল: দাদরা

১০৩। আনারকলি, আনারকলি,আনারকলি! তাল: কাহারবা

১০৪। গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়। রাগ: মালকোষ;তাল: দাদরা

১০৫। আমি গরবিনী মুসলিম বালা । তাল: কাহারবা

১০৬। দিকে দিকে পুন: জ্বলিয়া উঠেছে । রাগ: মার্চের সুর;তাল: কাহারবা

১০৭। জাগে না সে জোস ল'য়ে আর মুসলমান । রাগ; ভৈরবী;তাল: কাহারবা

১০৮। মহররমের চাঁদ এল ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়। রাগ: মিশ্র জয়-জয়ন্তী; তাল: সাদ্রা

১০৯। খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী । তাল: কাহারবা

১১০। ওগো মা ফাতেমা ছুটে আয়

১১১। ফোরাতের পানিতে নেমে ফাতেমা দুলাল কাঁদে

১১২। মরু সাহারা আজি মাতোয়ারা । তাল: কাহারবা

১১৩। আসিছেন হাবিবে খোদা, আরশ্‌পাকে তাই উঠেছে শোর তাল: কাহারবা

১১৪। সাহারাতে ফুট্‌ল রে ফুল রঙিন গুলে লালা । রাগ: পাহাড়ী;তাল: কাহারবা

১১৫। তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে। রাগ: নাত;তাল: দাদরা

১১৬। খোদা এই গরীবের শোনো শোনো মোনাজাত। রাগ: হাম্‌দ; তাল: কাহারবা

১১৭। শোন শোন য়্যা এলাহী। তাল: কাহারবা

১১৮। তোমারই প্রকাশ মহান্‌ এ নিখিল দুনিয়া জাহান । রাগ: মিশ্র দেশ টোড়ী; তাল: কাফা

১১৯। পুঁথির বিধান যাক্‌ পুড়ে তোর। রাগ: আলাহিয়া বিলাবল;তাল: দাদরা

১২০। হিন্দু-মুসলমান দু'টি ভাই। রাগ: ছায়ানট তাল; দাদরা

১২১। ভাই হয়ে ভাই চিন্‌বি আবার গাইব কি আর এমন গান । রাগ: মিশ্র-খাম্বাজ,তাল: দাদরা

১২২। আমার সোনার হিন্দুস্থান। রাগ: পাহাড়ি মিশ্র; তাল: কাহারবা

১২৩। আমার দেশের মাটি। তাল: লোফা

১২৪। কল কল্লোল ত্রিংশ কোটি কণ্ঠে উঠেছে গান । তাল: দাদরা

১২৫। এই ভারতে নাই যাহা, তা ভূ-ভারতে নাই। তাল: দাদরা

১২৬। ভারত আজিও ভোলেনি বিরাট মহাভারতের গান। তাল: দাদরা

১২৭। বীরদল আগে চল । রাগ: মার্চের সুর।

১২৮। টলমল টলমল পদভরে , বীরদল চলে সমরে। তাল: কেরতা

১২৯। আমরা শক্তি আমরা বল আমরা ছাত্রদল। তাল: লোফা

Dhaka University Institutional Repository

১৩০। জাগো দুস্তর পথের নবযাত্রী । রাগ: ব্যান্ডের ছন্দ

১৩১। দুরন্ত দুর্মদ প্রাণ অফুরান। তাল: ব্যান্ডের ছন্দ

১৩২। শংকাশূন্য লক্ষ কণ্ঠে বাজিছে শঙ্খ ওই । রাগ: মার্চের সুর

১৩৩। চলরে চপল তরুণ দল বাঁধন হারা। রাগ: মার্চের সুর

১৩৪। কারার ঐ লৌহ কপাট । তাল: দ্রুত দাদরা

১৩৫। এ কোন পাগল পথিক ছুটে এল বন্দিনী মার আঙিনায়। তাল: দাদরা

১৩৬। ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!

১৩৭। এসো এসো এসো ওগো মরণ । রাগ: মিশ্র বেলাওল; তাল: তেওড়া

১৩৮। আজি রক্ত নিশি -ভোরে। তাল: তেওড়া;

১৩৯। আজ না চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে

১৪০। ঘোর্ ঘোর্‌রে আমার সাধের চরকা ঘোর

১৪১। দেশপ্রিয় নাই শুনি ক্রন্দন সহসা প্রভাতে জাগি। রাগ: জয়জয়ন্তী মিশ্র; তাল: একতাল

১৪২। জাগো জাগো হে দেশপ্রিয় ।

১৪৩। জাগো আজ দন্ড হাতে চন্ডবাসী

১৪৪। বগল বাজা দুলিয়ে মাজা

১৪৫। ডুবলো ফুটো ধর্ম-তরী । রাগ: বেহাগ; তাল: দাদরা